বাংলা

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম

এম.এ.

চতুর্থ সেমেস্টার

পত্র : বি-কোর - ৪১২
তুলনামূলক সাহিত্য

পাঠ-সহায়ক উপাদান

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ
ডাইরেক্টরেট অফ ওপেন এ্যান্ড ডিস্ট্যান্স লার্নিং

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

কল্যাণী, নদীয়া-৭৪১২৩৫
পশ্চিমবঙ্গ

Post Graduate Board of Studies (PGBOS) Members of Department of Bengali, Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Sl. No.	Name & Designation	Role
1	**Prof. (Dr.) Sanjit Mondal,** Professor & Head, Department of Bengali, University of Kalyani.	Chairperson
2	**Prof. (Dr.) Sabitri Nanda Chakraborty** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
3	**Prof. (Dr.) Sukhen Biswas,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
4	**Prof. (Dr.) Prabir Pramanick,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
5	**Prof. (Dr.) Nandini Bandyopadhyay,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
6	**Prof. (Dr.) Adityakumar Lala,** Professor, Department of Bengali, Gourbanga University	External Nominated Member
7	**Prof. (Dr.) Narugopal Dey,** Professor, Department of Bengali, Sidho Kanho Birsha University	External Nominated Member
8	**Dr. Rajsekhar Nandi,** Assistant Professor of Bengali, DODL, University of Kalyani.	Member
9	**Prof. (Dr.) Tapati Chakrabarty,** Director, DODL, University of Kalyani	Convener

পাঠ প্রণেতা

অধ্যাপক ড. সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী — অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ড. প্রবীর প্রামাণিক — অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. পীযূষ পোদ্দার — সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

এপ্রিল, ২০২৪

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত ও ইস্ট ইন্ডিয়া ফটো কম্পোজিং সেন্টার, ২০৯এ, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ দ্বারা মুদ্রিত।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোনো অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইন অনুসারে পাঠ-সহায়ক উপাদানের জন্য লেখক বা পাঠ প্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Message

Satisfying the varied needs of distance learners, overcoming the obstacle of Distance and reaching the unreached students are the three fold functions catered by Open and Distance Learning (ODL) systems. The onus lies on writers, editors, production professionals and other personnel involved in the process to overcome the challenges inherent to curriculum design and production of relevant Self-Learning Materials (SLMs). At the University of Kalyani a dedicated team under the able guidance of the Hon'ble Vice-Chancellor has invested its best efforts, professionally and in keeping with the demands of Post Graduate CBCS Programmes in Distance Mode to devise a self-sufficient curriculum for each course offered by the Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Development of printed SLMs for students admitted to the DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2020 had been our endeavor. We are happy to have achieved our goal.

Utmost care and precision have been ensured in the development of the SLMs, making them useful to the learners, besides avoiding errors as far as practicable. Further suggestions from the stakeholders in this would be welcome.

During the production-process of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from **Professor (Dr.) Amalendu Bhunia, Hon'ble Vice-Chancellor, University of Kalyani**, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it with in proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Sincere gratitude is due to the respective chairpersons as well as each and every member of the PG-BoS (DODL), University of Kalyani. Heartfelt thanks are also due to the Course Writers-faculty members at the DODL, subject-experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have enriched the SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would especially like to convey gratitude to all other University dignitaries and personnel involved either at the conceptual or operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their persistent and coordinated efforts have resulted in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self-Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyrights reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self-Learning Materials are self writing and collected from e-book, journals and websites.

Director
Directorate of Open and Distance Learning
University of Kalyani

বাংলা
স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম
এম.এ.
চতুর্থ সেমেস্টার
পাঠক্রম
পত্র—বি-কোর - ৪১২
তুলনামূলক সাহিত্য

পর্যায় গ্রন্থ ১ (সময় ৪ ঘণ্টা)

একক ১. তুলনামূলক সাহিত্য : সাধারণ ধারণা

পর্যায় গ্রন্থ ২ (সময় ৪ ঘণ্টা)

একক ১. অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ (চতুর্থ অঙ্ক) : কালিদাস
একক ২. শকুন্তলা, মিরান্দা এবং দেসদিমনা : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
একক ৩. শকুন্তলা : বিদ্যাসাগর
একক ৪. শকুন্তলা : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
একক ৫. শকুন্তলা (প্রাচীন সাহিত্য) : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পর্যায় গ্রন্থ ৩ (সময় ৪ ঘণ্টা)

একক ১. মেঘদূত (পূর্বমেঘ) : কালিদাস
একক ২. মেঘদূত (প্রাচীন সাহিত্য) : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
একক ৩. মেঘদূত (চৈতালি) : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
একক ৪. যক্ষ (সানাই) : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
একক ৫. যক্ষের নিবেদন : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পর্যায় গ্রন্থ ৪ (সময় ৪ ঘণ্টা)

একক ১. সফোক্লেস এর আন্তিগোনে (শিশিরকুমার দাশ অনূদিত)
একক ২. হ্যামলেট : শেক্সপীয়ার (অনুবাদ সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ)
একক ৩. চাকভাঙা মধু : মনোজ মিত্র
একক ৪. কন্যাদান : বিজয় তেণ্ডুলকার (অনুবাদ — এস বি যোশী এবং নীতিশ সেন)

পত্র—বি-কোর - ৪১২
তুলনামূলক সাহিত্য

সূচিপত্র

পত্র—বি-কোর-৪১২	একক	শিরোনাম	পাঠ প্রণেতা	পৃষ্ঠা
পর্যায় গ্রন্থ ১	১.	তুলনামূলক সাহিত্য : সাধারণ ধারণা	অধ্যাপক ড. সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী	১-২
পর্যায় গ্রন্থ ২	১. ২. ৩. ৪. ৫.	অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ (চতুর্থ অঙ্ক) : কালিদাস শকুন্তলা, মিরান্দা এবং দেসদিমনা : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শকুন্তলা : বিদ্যাসাগর শকুন্তলা : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর শকুন্তলা (প্রাচীন সাহিত্য) : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	অধ্যাপক ড. সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী	৩-৫ ৬-৮ ৯-১০ ১১-১৫ ১৬-১৯
পর্যায় গ্রন্থ ৩	১. ২. ৩. ৪. ৫.	মেঘদূত (পূর্বমেঘ) : কালিদাস মেঘদূত (প্রাচীন সাহিত্য) : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মেঘদূত (চৈতালি) : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যক্ষ (সানাই) : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যক্ষের নিবেদন : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	ড. পীযূষ পোদ্দার	২০-২১ ২২-২৩ ২৪-২৫ ২৬-২৬ ২৭-২৮
পর্যায় গ্রন্থ ৪	১. ২. ৩. ৪. ৫. ৬.	তুলনামূলক সাহিত্য তুলনামূলক সাহিত্যের সংজ্ঞা, স্বরূপ ও বিশ্লেষণ তুলনামূলক সাহিত্য : পরিবর্তিত লক্ষ্যে, নতুন পথে তুলনামূলক নাটকের আলোচনা (আন্তিগোনে, হ্যামলেট, চাকভাঙা মধু, কন্যাদান) হাইমোন নাট্যচরিত্র হ্যামলেট ও মহম্মদের সঙ্গে তুলনা তুলনামূলক নাটকের ট্র্যাজেডি (আন্তিগোনে, হ্যামলেট, চাকভাঙা মধু)	অধ্যাপক ড. প্রবীর প্রামাণিক	২৯-৩১ ৩২-৩৫ ৩৬-৪৮ ৪৯-৫৮ ৫৯-৭১ ৭২-৮০

পত্র : বি-কোর-৪১২

তুলনামূলক সাহিত্য

পর্যায় গ্রন্থ : ১

একক-১

সাধারণ ধারণা

বিন্যাসক্রম :

৪১২.১.১.১ : প্রস্তাবনা

৪১২.১.১.১ : প্রস্তাবনা

সাহিত্য সমালোচকদের প্রতিষ্ঠিত রীতি পদ্ধতির মধ্যে তুলনামূলক সাহিত্য সমালোচনার পদ্ধতিটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দেশ-বিদেশে রচিত সাহিত্য পাঠ করার পর বিদগ্ধ জনমানসে বিভিন্ন সাহিত্য বিষয়ে যখন তুল্যমূল্য আলোচনা চলতে থাকে, সেই আলোচনার দ্বারা সাহিত্যের ফর্মের পর্যালোচনা প্রতিষ্ঠিত হয়, এভাবেই তুলনামূলক সাহিত্য সমালোচনার ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একই ভাষায় রচিত ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্যিকের রচিত সাহিত্য, অথবা বিভিন্ন ভাষায় রচিত সাহিত্যের ভাবনা ও রচনার ফর্ম বিষয়ক, গঠন বিষয়ক, রস বিষয়ক তুলনামূলক আলোচনা তুলনামূলক সাহিত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সাহিত্যের ভাবনা ও বিষয়গত সৌন্দর্যতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একাধিক সাহিত্যকারের রচনাকে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করা হয়, এতে সাহিত্য পাঠের রস, সৌন্দর্য, তত্ত্ব ও সমকালের জনমানসে তার প্রতিফলন যথার্থ পরিস্ফুট হয়। তাই তুলনামূলক সাহিত্য সমালোচনা সাহিত্য পাঠের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গদর্শন' সাহিত্যপত্রে 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধ রচনার মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষায় সাহিত্য সমালোচনা ক্ষেত্রটির সূচনা করেন। বাল্মীকি রামায়ণের শেষ পর্ব আশ্রয়ে ভবভূতি 'উত্তররামচরিত' রচনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'উত্তররামচরিত' প্রবন্ধে বাল্মিকী ও ভবভূতির তুলনামূলক কাব্য ভাবনার আলোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে উত্তরচরিতের শ্রেষ্ঠতা, তাঁর রচনা সৌকর্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ভবভূতি অষ্টম শতকের নাট্যকার। তাঁর নাটক করুণ রসাত্মক। সীতা নির্বাসন বৃত্তান্ত অবলম্বন করে একটি অত্যুৎকৃষ্ট নাটক প্রণয়ন করেছিলেন তিনি। বঙ্কিমচন্দ্রের উক্ত সমালোচনা মূলক প্রবন্ধটি পড়ে একই সঙ্গে পাঠক বাল্মিকীর রামায়ণ এবং ঐ প্রসঙ্গে ভবভূতির উত্তররামচরিতের চরিত্রবিন্যাস, ঘটনাবিন্যাস ও রসসম্পাদন তুলনামূলক আলোচনায় পাঠকের চিত্তে সাহিত্য ভাবনা বিশেষরূপে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাহলে এক্ষেত্রে বলা যায় যে সমালোচনা

পদ্ধতিতে দুই ভিন্ন লেখকদের একই বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচনার তুলনামূলক আলোচনা করা হয়ে থাকে তাকে তুলনামূলক সমালোচনা বলে গণ্য করা হয়। তুলনামূলক সমালোচনা করতে গেলে এক দেশের সাহিত্যের সঙ্গে অন্য দেশের সাহিত্য প্রসঙ্গ এসে পড়ে। সাহিত্যের ধারণা ভিত্তিক, ইতিহাস ভিত্তিক, সমাজ ভিত্তিক, সাহিত্যের শাখা ভিত্তিক -এর যে কোনো পদ্ধতিতেই তুলনামূলক সমালোচনা সম্ভব। তবে এটি শুধু কাব্যের সঙ্গে কাব্যের নয়, কাব্যের সঙ্গে চিত্রকলার, কাব্যের সঙ্গে সংগীতের তুলনাও হতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে পাশ্চাত্য সাহিত্য বিচারের পন্থা অনুসরণ করেছিলেন। তুলনামূলক পদ্ধতির ধারায় জয়দেব ও বিদ্যাপতি, কালিদাসের 'কুমারসম্ভবের' সঙ্গে কবি মিলটনের 'প্যারাডাইস লস্ট' এর তুলনা, অথবা কালিদাসের 'শকুন্তলার' সঙ্গে শেক্সপিয়রের দুই নায়িকা মিরন্দা ও দেসদিমোনার সাদৃশ্য নিয়ে সুচিন্তিত বিশ্লেষণ করেছেন রসজ্ঞ সমালোচক। দুটি বিপরীত নাটকের দুটি পৃথক নায়িকার সঙ্গে শকুন্তলার চরিত্রের সমালোচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র শকুন্তলা চরিত্রের গভীরতা ও ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই সমালোচনার মাধ্যমে পাঠকের চিত্তে সাহিত্যবোধের রসোপলব্ধির এক সম্পূর্ণতা প্রকাশ পায়। এখানেই তাঁর আলোচনার সার্থকতা।

বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রবন্ধ (তুলনামূলক সমালোচনা প্রবন্ধ) প্রকাশ করেন 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' নামে। এই প্রবন্ধটি পাঠ করে সাহিত্য বিশ্লেষণের নিজস্ব ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করেন- 'বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাস'। রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটি পাঠ করে বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত প্রীত হন, এবং তাঁর নিজের প্রবন্ধের ক্ষেত্রে সংশোধনও করেন। তুলনামূলক সাহিত্য সমালোচনার ধারা এইভাবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্যে যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছিল।

পত্র : বি-কোর-৪১২

তুলনামূলক সাহিত্য

পর্যায় গ্রন্থ : ২

একক-১

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্

বিন্যাসক্রম :

৪১২.২.১.১ : প্রস্তাবনা

৪১২.২.১.২ : শকুন্তলা ও সখীদ্বয়

৪১২.২.১.৩ : অভিশাপের গুরুত্ব

৪১২.২.১.১ : প্রস্তাবনা

কালিদাস চতুর্থ-পঞ্চম শতকের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বানভট্টের 'কাদম্বরী'তে কবি কালিদাসের উল্লেখ আছে। এই প্রেক্ষিতেই বলা যায়- কবি কালিদাস ষষ্ঠ শতকের আগে জন্মগ্রহণ করেন। ঋষি কণ্বের তপোবনে প্রতিপালিত আশ্রম বালিকা শকুন্তলার সঙ্গে প্রবল পরাক্রান্ত পুরু বংশীয় রাজা দুষ্মন্তের পরিণয়, এবং রাজধানীতে ফিরে গিয়ে এই ঘটনা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হওয়া- এই আখ্যান মহাভারত থেকে নিয়ে কালিদাস 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটক রচনা করেন। স্যার উইলিয়াম জোনস প্রাচ্যসাহিত্য ভান্ডারের থেকে 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' অনুবাদ করেন। তাঁর চেষ্টাতেই 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' সারা বিশ্বে সমাদৃত হয়।

'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের চতুর্থ অঙ্কটিতে এই নাটকের সর্বাপেক্ষা মর্মস্পর্শী দৃশ্যটি অঙ্কিত হয়েছে। বিচ্ছেদ সততই বিষাদপূর্ণ - জীবনের এই সারসত্যটিই এই অঙ্কের মূল উপজীব্য। গান্ধর্বমতে শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের পরিণয় সম্পন্ন হলেও রাজর্ষি কি রাজধানীতে ফিরে গিয়ে এই আশ্রমে ঘটে যাওয়া ঘটনা মনে রাখবেন সে বিষয়ে শকুন্তলার সখী অনসূয়া চিন্তান্বিতা। অপরদিকে সখী প্রিয়ংবদা শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের এই পরিণয় পিতা কণ্বের অনুমোদন ও আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে কিনা, সেই বিষয়ে সন্দিহান। প্রতিটি পিতারই একান্ত ইচ্ছা গুণবান তথা সুপাত্রে কন্যা সম্প্রদান, আর তা যদি দৈবক্রমে গঠিত হয়ে থাকে তবে সেই ঘটনা অবশ্যই সন্তোষজনক। কিন্তু শকুন্তলার সৌভাগ্য ক্ষণস্থায়ী।

পতিচিন্তায় ভাববিভোর শকুন্তলা এতটাই আত্মহারা ছিলেন যে আশ্রমে অতিথির প্রবেশ অনুমান করতে

পারেননি। শকুন্তলার এ হেন আচরনে ক্রুদ্ধ ঋষি দুর্বাসা শকুন্তলার উপর অভিশাপ বর্ষণ করেন- যার চিন্তায় শকুন্তলা অতিথি অবমাননা করল সেই ব্যক্তি শকুন্তলাকে বিস্মৃত হবে। মহর্ষি দুর্বাসা প্রদত্ত অভিশাপের কথা জানতে পেরে অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা ঋষির কাছে কাতর প্রার্থনা করে- এই অভিশাপের প্রতিকার জেনে নেয়- অভিজ্ঞান বা স্মারক চিহ্ন প্রদর্শন করলে এই অভিশাপের প্রভাব দূর হবে। সখীদ্বয় আশ্বস্ত হয় এই ভেবে যে দুষ্মন্ত প্রদত্ত নিজ নামাঙ্কিত একটি আংটি শকুন্তলার কাছে রয়েছে। সঠিক সময়ে যার প্রদর্শনে শকুন্তলা এ আসন্ন দুর্দৈব্য থেকে রক্ষা পেতে পারেন।

কাল অতিক্রান্ত হলেও মহারাজ দুষ্মন্তের কোনো বার্তা আশ্রমে এসে পৌঁছায় না। অপরদিকে মহর্ষি কণ্ব দৈববাণীর মাধ্যমে শকুন্তলা পরিণয় ও গর্ভের কথা অবগত হন। পিতার কর্তব্য স্থির করে তিনি শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণের উদ্যোগ নেন। শকুন্তলার যাত্রাসঙ্গী হিসেবে শার্ঙরব ও সারদ্বত-কে নির্বাচন করা হয়। আশ্রম থেকে শকুন্তলার বিদায় কাল বড়ই করুণ ও অশ্রুজলসিক্ত। পিতৃগৃহ বিদায় কালে মাতা গৌতমী তার আন্তরিক আশীর্বাদ ও সাংসারিক উপদেশ জ্ঞাপন করেন। বনের পশু-পাখি তথা বনদেবী (প্রকৃতি) পুষ্প আভরণে শকুন্তলাকে সাজিয়ে দেন। দৈববাণী হয় দেবতারাও আশীর্বাদ করেন, যাতে শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা সুখকর ও মঙ্গলময় হয়ে ওঠে। অবশেষে সকল আচার-অনুষ্ঠান সমাপ্ত করে শকুন্তলার যাত্রারম্ভ হয়। আজন্ম স্মৃতি বিজড়িত এই তপোবন থেকে যাত্রাকালে শকুন্তলার কোমল হৃদয় ব্যথিত হয়ে ওঠে। বনলতা, নবমালিকা, হরিণ শিশুর তথা সমস্ত প্রকৃতি ও আশ্রম বাসীরা কন্যা বিদায়ের এই মুহূর্তে শোকবিহ্বল হয়ে ওঠে।

৪১২.২.১.২ : শকুন্তলা ও সখীদ্বয়

মহাকবি কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে মহর্ষি কন্বের তপোবনে সযত্নে পালিত হন শকুন্তলা। তার বালিকা বয়সের সহচরী দুই সখীর উল্লেখ পাওয়া যায়- অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা। যদিও ব্যাস রচিত মহাভারতে এই দুই সখীর কোনোরূপ উল্লেখ নেই। মহাকবি কালিদাস শকুন্তলার চরিত্রকে আরও সুচারুভাবে ফুটিয়ে তুলতেই এই দুই সখী চরিত্রের অবতারণা করেন। প্রিয়ভাষিণী প্রিয়ংবদা ও পরিণতমনা অনসূয়ার সান্নিধ্যে শকুন্তলার বেড়ে ওঠা।

দুষ্মন্তের সাথে শকুন্তলার পরিচয়, প্রণয় ও পরিণয়ের প্রত্যক্ষ সাক্ষী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা। পতি বিরহে কাতরা শকুন্তলার মনব্যথা অনসূয়ার হৃদয়কেও ব্যাথিত করে তোলে। দুর্বাসার অভিশাপ থেকে শকুন্তলাকে রক্ষা করতে ও তার সৌভাগ্য সুনিশ্চিত করতে ঋষির ক্রোধকে মিস্ট ভাষায় তুষ্ট করে প্রিয়ংবদা। শকুন্তলার পতিগৃহে বিদায় কালে এই দুই অভিন্ন হৃদয় ভগিনীসমা সখী আসন্ন বিচ্ছেদ ভাবনায় কাতর হয়ে পড়ে। শকুন্তলা চরিত্রকে আপন মহিমায় প্রস্ফুটিত করার উদ্দেশ্যেই অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা- এই দুই সখী চরিত্রের সৃজন করা হয়েছে। শকুন্তলার পতিগৃহে বিদায়ের সঙ্গে এই দুই চরিত্রের প্রয়োজন সমাপ্ত হয়।

৪১২.২.১.৩ : অভিশাপের গুরুত্ব

মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকটির চতুর্থ অঙ্কে এক নিদারুন অভিশাপের উল্লেখ রয়েছে। তপোবন লালিতা কন্যা শকুন্তলা তার পতি দুষ্মন্তের কথা চিন্তা কালে এতটাই আত্মবিহ্বল ছিল যে, আশ্রমে অতিথির আগমন সম্পর্কে সে জানতে পারেনি। যথাযথ অতিথি অভ্যর্থনায় ত্রুটি হওয়াতে মহর্ষি দুর্বাসা ক্রোধিত

হন এবং শকুন্তলাকে অভিশাপ দেন এই বলে- যে ব্যক্তির চিন্তায় শকুন্তলা অতিথির অপমান করলো, সেই ব্যক্তি শকুন্তলাকে সম্পূর্ন রূপে বিস্মৃত হবে। তবে পরে মহর্ষি সদয় হয়ে শকুন্তলাকে শাপ মুক্তির উপায় বলে দেন - কোনো অভিজ্ঞান বা স্বারক চিহ্ন প্রদর্শন করলে তার শাপমুক্তি ঘটবে।

এই নাটকে মহর্ষি দুর্বাসা প্রদত্ত এই অভিশাপ কেবলমাত্র শকুন্তলাকে তার কর্তব্য অবহেলার ফলস্বরূপ শাস্তিবিধান নয়, এর গূঢ় তাৎপর্য রয়েছে। মহারাজ দুষ্মন্তের চরিত্রকে আরও মার্জিত ও পরিশীলিত করার জন্য এই অভিশাপ বিধান ও সেই সম্পর্কযুক্ত নানাবিধ ঘটনা ঘটার প্রয়োজন ছিল। দুর্বাসা প্রদত্ত এই অভিশাপ প্রকারান্তরে মহারাজ দুষ্মন্তের চরিত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

পত্র : বি-কোর-৪১২

তুলনামূলক সাহিত্য

পর্যায় গ্রন্থ : ২

একক-২

‘শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেসদিমনা’ — বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিন্যাসক্রম :

৪১২.২.২.১ : প্রস্তাবনা

৪১২.২.২.১ : প্রস্তাবনা

বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তুলনামূলক আলোচনা ‘শকুন্তলা মিরান্দা এবং দেসদিমনা’। তিনটি নাটকের তিনটি নারী চরিত্র। মহাকবি কালিদাসের ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলমের’ শকুন্তলার সঙ্গে শেক্সপিয়ারের ‘টেমপেস্ট’ নাটকের মিরান্দা এবং ‘ওথেলো’ নাটকের দেসদিমনার তুলনা পর্যায়ক্রমে করা হয়েছে এই প্রবন্ধে। শকুন্তলা এবং মিরান্দা উভয়ই অরণ্য প্রতিপালিত, উভয়ের চরিত্রের বিশেষ গুণ সরলতা। কিন্তু লোকালয়ের থেকে বিচ্ছিন্ন তপোবনে পালিতা শকুন্তলা, আর রাজ্যচ্যুত প্রস্পেরোর কন্যা মিরান্দা নির্জন দ্বীপে পালিতা। দুজনের চরিত্রে সমাজবদ্ধ মানুষের মনের যে আত্মসচেতনতা, রূপ-মালিন্য এবং আত্মসংকীর্ণতা তা নেই। শকুন্তলার সঙ্গে তপোবন প্রকৃতির অন্তরঙ্গ সম্পর্ক, নবমালিকার সঙ্গে ভগিনী সম্পর্ক, সহকার তরুর প্রতি ভাতৃ সম্পর্ক, মাতৃহীন হরিণ শিশুর প্রতি পুত্র সম্পর্ক। তপোবনের বৃক্ষলতা তরু প্রভৃতিতে জলসেচন করে তাদের পুষ্প উদ্গম হলে তার স্থাপিত জীবনের পরিপূর্ণতা মেলে। কিন্তু তিনি সরলা হলেও অশিক্ষিতা নন। তার মানসিকতার সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক প্রকাশিত হয় যখন তার চরিত্রের স্বাভাবিক লজ্জা প্রকাশিত হয়। তার পরিণয়ের কথাও তিনি সখীদের কাছে নিজের মুখে ব্যক্ত করতে পারেন না। দুষ্মন্তের সান্নিধ্যেও তিনি লজ্জাবনত মৌন।

তুলনায় মিরান্দা সরল হলেও সমাজে বসবাস না করার ফলে তিনি সামাজিক সহবত শিক্ষায় অভ্যস্ত নন। তাই প্রথমে অপরিচিত পর পুরুষকে দেখে মিরান্দা ফার্দিনান্দের রূপের প্রশংসা অসংকোচে করেছে। স্ত্রী চরিত্রের যে লজ্জা, সংকোচ তা মিরান্দার নেই। সে যে ফার্দিনান্দের রূপে মুগ্ধ একথা স্পষ্ট বলেছে। কিন্তু মিরান্দার সরলতা আছে। সে দুঃখে কাতরা, কিন্তু সংস্কারহীনা, তাই একথাও সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে, মিরান্দা

চরিত্রে কোন মালিন্য নেই, এবং তার চিত্ত পবিত্র। পিতা প্রস্পেরো এবং কালিবান ছাড়া আর কোন পুরুষকেই সে দেখেনি। তাই পর পুরুষের সঙ্গে অসংঙ্কোচে আলাপ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু শকুন্তলার প্রণয় মুখে অব্যক্ত ছিল। শকুন্তলার সঙ্গে আশ্রম প্রকৃতির ছিল গভীর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। কিন্তু মিরান্দা অনুচর এরিয়েলের সঙ্গেও ভৃত্যের মতো ব্যবহার করতেন। মিরান্দার চরিত্রে স্নেহ আন্তরিকতার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় না। তাই তার সঙ্গে শকুন্তলার চারিত্রিক সৌন্দর্যের কোন তুলনাই হয়না। প্রকৃতিপেলব শকুন্তলার অন্তঃকরণ বর্ণনায় মহাকবি কালিদাস যেভাবে মনোসংযোগী হয়েছেন টেম্পেস্ট নাটকে মিরান্দায় তা দেখা যায় না।

দেসদিমনা শকুন্তলার সঙ্গে তুলনীয়া নন, কারণ শেক্সপীয়রের এই নাটক সাগরের মত বিপুল ও গভীর। কালিদাসের নাটক সাজানো বাগানের মত- নন্দনকানন। কাননে সাগরের তুলনা হয়না। কানন সুদৃশ্য, মনোহর, সুখকর। সাগর দুস্তর, গভীর, অপর্যাপ্ত। তাই শেক্সপীয়রের নাটকে প্রবল বেগ, দুরন্ত কোলাহল, সংক্ষুব্ধ ঊর্মিলীলা। তাই দেসদিমনা শকুন্তলার তুলনীয় নয়। উভয় চরিত্রের মধ্যে জাতিভেদ আছে।

একথাও ঠিক ভারতবর্ষে যাকে নাটক বলে, ইউরোপে তাকে নাটক বলেনা। কালিদাসের নাটক আখ্যান কাব্য, শেক্সপীয়রের নাটক জীবনের যথার্থ প্রতিচ্ছবি। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের মতে দেসদিমনা সজীব, শকুন্তলা ও মিরান্দা ধ্যানের বিষয়। দেসদিমনার বেদনা ও ক্রন্দন আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে। শকুন্তলার দুঃখের বিস্তার নেই, গতি নেই। সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, শকুন্তলা চিত্রকরের চিত্র, দেসদিমনা ভাস্করের ভাস্করজ। শকুন্তলা অর্ধেক মিরান্দা, অর্ধেক দেসদিমনা। অপরিনীতা শকুন্তলা মিরান্দার অনুরূপিনী, পরিনীতা শকুন্তলা দেসদিমনার ছায়া।

এই প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশে ওথেলো নাটকের নায়িকা দেসদিমোনার সঙ্গে পঞ্চমাঙ্কে দুষ্মন্তের প্রত্যাখানের পর শকুন্তলার তুলনা করা হয়েছে। প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলাকে বোঝা যায় দেসদিমোনার সঙ্গে তুলনার পর। দুজনেই বীরপুরুষের প্রতি আসক্ত হয়ে আত্মসমর্পন করেছিলেন। কিন্তু বীরের প্রতি যে মুগ্ধতা এই দুই নায়িকারই আছে, তবু তা দেসদিমোনার জীবনে যতটা প্রতীয়মান, শকুন্তলার জীবনে ততটা নয়। ওথেলো কৃষ্ণকায় কিন্তু রূপের মোহ অপেক্ষা বীর পুরুষের প্রতি আকর্ষণ দেসদিমোনার কাছে প্রাধান্য পেয়েছে। যেমন, দ্রৌপদী অর্জুনের প্রতি অধিকতর অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু সংসারে স্নেহভাবনা বিনষ্ট বা বিস্মৃত হয়ে যায় নানা ঘটনায়। ওথেলোর মনে সন্দেহের বীজ রোপিত হয় এবং তিনি দেসদিমোনাকে অবিশ্বাসিনী মনে করেন। শকুন্তলাকে বিস্মৃত হলেন দুষ্মন্ত দুর্বাসার শাপে, রাজসভায় শকুন্তলা সর্বসমক্ষে স্বামী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হলে বেদনার্ত এবং ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন-

"অনার্য আপনার হৃদয়ের ভাবে সকলকে দেখ?"

-তদুত্তরে রাজা বলেন, ভদ্রে সকলেই দুষ্মন্তের চরিত্রকে জানে। কিন্ত ওথেলো ভীষণ রাক্ষসের মতো নিশীথ শয্যাশায়িনী সুপ্তা সুন্দরীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে যখন বললেন, "বধ করবো" - দেসদিমোনা রাগ, বেদনা, অভিমান না করেই বললেন, "তবে ঈশ্বর আমায় রক্ষা করুন"- কোন ভয় তিনি পাননি, তিনি মরণাপন্ন দেখে ইমিলিয়া যখন জিগ্যেস করলেন, কে এই কাজ করেছে? দেসদিমোনা বললেন, আমার প্রভুকে প্রনাম জানিয়ে আমি যাই। এখানে দেসদিমোনা অদ্বিতীয়া, তাঁর সঙ্গে শকুন্তলার তুলনা করা যায় না। দেসদিমোনা ও তার পরিজন কোন মানুষের কাছে জানায়নি যে তার প্রকৃত হত্যাকারীকে। রাগ-অভিমান দেসদিমোনার নেই, যখন ওথেলো দেসদিমোনাকে সর্বসমক্ষে প্রহার করেন, তখনো দেসদিমোনা বলেন,

"আমি আপনার সম্মুখ থেকে চলে যাচ্ছি, আমি যে নিরপরাধিনী তা ঈশ্বর জানেন।"

তাই একথা বলা যায় যে শেক্সপিয়ারের নাটকের সঙ্গে কালিদাসের নাটকের তুলনা করাও যায় না, শেক্সপিয়ারের

নাটক সাগরবৎ, কালিদাসের নাটক নন্দনকানন তুল্য। দেসদিমোনা এবং শকুন্তলারও তুলনীয় নন। নাটক হিসেবে 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ এবং 'ওথেলো' একরকম নয়। ভারতবর্ষে যাকে নাটক বলে ইউরোপে তাকে নাটক বলে না। কালিদাসের নাটক নন্দনকাননতুল্য অর্থাৎ তার উপমা চিত্রকল্প তার বাহ্যিক অলঙ্করণ। কিন্তু শেক্সপীয়রের নাটক সাগরের মত অতল, তার সৌন্দর্য ও বিস্তার তুলনাহীন। ভারতবর্ষে নাটক দৃশ্যকাব্য। উৎকৃষ্ট কাব্যগুণ আছে শকুন্তলা নাটকে। দেসদিমনা চরিত্র উজ্জ্বল, আমাদের সামনে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত, পরিস্ফুট, সজীব। তাই সমালোচক বলেন, শকুন্তলা চিত্রকরের চিত্র, দেসদিমনা ভাস্করের গঠিত সজীব প্রায় গঠন।

দেসদিমনার আলেখ্য এমন দীপ্ত, শকুন্তলা তার সমকক্ষা নন। তাই শকুন্তলা যেন অর্ধেক মিরান্দা, অর্ধেক দেসদিমনা। পরিণত শকুন্তলা দেসদিমনার অনুরূপিনী। এইভাবে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে দুটি ইউরোপীয় নাটকের সঙ্গে কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ এই নাটকের চরিত্র কাবোত্তম এবং সৌন্দর্যময় উপস্থাপন যথাযথভাবে বিশ্লেষনের মধ্যে পাঠকের চিত্তে রসসৌন্দর্যের যথার্থ আস্বাদনের সম্পূর্ণভাবে উপস্থাপিত হয়।

পত্র : বি-কোর-৪১২

তুলনামূলক সাহিত্য

পর্যায় গ্রন্থ : ২

একক-৩

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অনূদিত 'শকুন্তলা'

বিন্যাসক্রম :

৪১২.২.৩.১ : প্রস্তাবনা

৪১২.২.৩.১ : প্রস্তাবনা

বিদ্যাসাগরের শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা অনুবাদ কর্ম হিসেবে আদর্শ ভাষা রূপে গৃহীত হয়েছে। শকুন্তলার গদ্য অনুকরণীয় হয়েছে এবং পরবর্তীকালের ভাষাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। শকুন্তলার ভাষা যেমন স্বচ্ছন্দ্য হয়েছে, তেমনি মূলানুগ হয়েও সরস ও স্বাধীন ধরনের রচনার রূপ ধরেছে। বলা যায় বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা থেকে বাংলার পাঠক সমাজ কথাসাহিত্যের রস উপলব্ধি করতে পেরেছিল। সমালোচকদের মন্তব্য,

> "রবীন্দ্রনাথ যেমন মহাকবি কালিদাসকে রসের দৃষ্টিতে বিচার করে মহাকবিকে বাঙালির কাছে নতুন মহিমায় তুলে ধরেছেন (প্রাচীন সাহিত্য) বিদ্যাসাগর তেমনি সংস্কৃত অনভিজ্ঞ বাঙালি পাঠককে কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলের রস উপভোগে সাহায্য করেছিলেন। "শকুন্তলা" নাটকটিকে গদ্য আখ্যানে পরিণত করে আধুনিক যুগে কথাসাহিত্য হিসেবে শকুন্তলার প্রচলন করেছিলেন বিদ্যাসাগর। তাঁর এই অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়"।

এরপর উল্লেখযোগ্য বিষয় হল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বাদু বাংলা সাহিত্য রসসমৃদ্ধ অনুবাদ। এপ্রসঙ্গে স্মরণীয় নিম্নলিখিত ছত্রগুলির অনুবাদ--

"ভো ভো সন্নিহিতস্থ পোবণতরব

পাতুঙ ন প্রথম ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপীতেষু

যা নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম।

আদ্যে ব কুসুম প্রসূতি সময়ে যস্যা ভবতুৎসব

সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সবৈঅনুজ্ঞায়তাম।"

এই বলিয়া তপোবন তরুদিগকে সম্মোধন করিয়া কহিলেন-

> "হে সন্নিহিত তরুগণ! যিনি তোমাদের জল সেচন করিয়া না করিয়া, কদাচ জলপান করিতেন না, যিনি ভুষণপ্রিয়া হইয়াও স্নেহবশত কদাচ তোমাদের পল্লব ভঙ্গ করিতেন না, তোমাদের কুসুম প্রসবের সময় উপস্থিত হইলে যাহার আনন্দের সীমা থাকিত না, অদ্য সেই শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছেন। তোমরা সকলে অনুমোদন করো।"

নাটককে কাহিনীর আকারে রূপায়িত করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর কোন কোন স্থলে অলৌকিকতা বর্জন করেছেন। বিদ্যাসাগর আধুনিক যুগের আধুনিক পাঠককে সাহিত্য রসের সঙ্গে পরিচিত করিয়েছেন। এখানে তাঁর আধুনিক মনস্কতা লক্ষ্য করা যায়। মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে ফিরে এসে দৈববাণীর দ্বারাই দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পরিণয় বৃত্তান্ত জানতে পারেন। এখানে দৈববাণীর সহায়তা অপরিহার্য, কাজেই বিদ্যাসাগর তা যথাযথ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু শকুন্তলার পতিগৃহে যাবার (চতুর্থ অঙ্কে) সময় আকাশবাণীর কল্যাণ দান অপ্রাসঙ্গিক বোধে বিদ্যাসাগর তা সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেছেন। শকুন্তলার পতিগৃহে যাওয়ার পূর্বে তাকে সুসজ্জিত করার জন্য কবি কালিদাস দেবপ্রদত্ত অলংকারের সৃষ্টি করেছেন। বিদ্যাসাগর এই বর্ণনাটি পরিহার করেছেন। বিদ্যাসাগর যথাসাধ্য অলৌকিক ব্যাপার বর্জন করতে সংকুচিত হননি। শুধু সংক্ষেপে বলেছেন,

> "অনুসূয়া এবং প্রিয়ংবদা যথাসম্ভব বেশভূষণ সমাধান করিয়া দিলেন।"

মূল নাটকের স্ত্রী বিদূষক, রাজশ্যালক, রক্ষীদ্বয় এবং ধীবরের প্রাকৃত বাক্যের অনুবাদের সময়ে বিদ্যাসাগর যথাসম্ভব চলতি ও হালকা শব্দ ব্যবহার করেছেন। উদাহরণ (অনুবাদ) দেওয়া যাক -

> "গৌতমী- বাছা শুনিলাম, আজ তোমার বড় অসুখ হয়েছিল, এখন কেমন আছো, কিছু উপশম হয়েছে? শকুন্তলা কহিলেন- হ্যাঁ পিসি! আজ বড় অসুখ হয়েছিল; এখন অনেক ভালো আছি। তখন গৌতমী কমণ্ডলু হইতে শান্তিজ লইয়া শকুন্তলার সর্বশরীরে সেচন করিয়া কহিলেন, বাছা! সুস্থ শরীরে চিরজীবিনী হয়ে থাকো।" (বিদ্যাসাগর রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৭৫)

বিদ্যাসাগর অনুবাদের বহু স্থলে মুখের ভাষা ও রস বজায় রাখবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। প্রয়োজনে কখনও সহজ কখনও আলংকারিক শব্দ প্রয়োগেও কুণ্ঠিত হন নি। নাটককে কাহিনীর আকারে রূপায়ণ করতে গিয়ে বিদ্যাসাগরকে কোনো কোনো অংশে মূল নাটকের অনেক কবিত্বময় অংশ পরিত্যাগ করতে হয়েছে। যাই হোক, বিদ্যাসাগরের উদাহরণ দেখে এবং তুলনা করে বলা যায় যে- এর পূর্বে এরকম সুললিত সচ্ছন্দ গদ্য রচনা বাংলা ভাষায় আগে আর দেখা যায় নি। এই অনুবাদকর্ম সাধারণ পাঠকদের যেমন আকৃষ্ট করে, তেমনি অভিজ্ঞান শকুন্তলা কাব্যটিকে সেকালের পাঠকের কাছে সরস, সহজভাবে গ্রহণ করার উপযোগী করে তোলেন।

পত্র : বি-কোর-৪১২

তুলনামূলক সাহিত্য

পর্যায় গ্রন্থ : ২

একক-৪

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'শকুন্তলা'

বিন্যাসক্রম :

৪১২.২.৪.১ : প্রস্তাবনা

৪১২.২.৪.২ : সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর

৪১২.২.৪.১ : প্রস্তাবনা

অবনীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের মধ্যে যে নূতন সৃষ্টিশীল মননের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে সেই ভাবনার আলেখ্য নিয়ে রচিত শকুন্তলার অনুবাদ। সমগ্র অনুবাদটি চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। যথা- 'শকুন্তলা', 'দুষ্যন্ত', 'তপোবন' ও 'রাজপুরে'। এই চারটি অধ্যায়কে অনুবাদক ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়ে কাহিনী বিন্যস্ত করেছেন। যে কাহিনীর সূত্র মহাকবি কালিদাস বিরচিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'র অনুসরণে সজ্জিত। প্রথম থেকে আমরা জানতে পারি শকুন্তলা আশ্রম কন্যা। সে মহর্ষি কণ্ব এবং মা গৌতমীর দ্বারা প্রতিপালিতা। তবে সদ্যোজাত শিশু শকুন্তলাকে জন্মদাত্রী মা অপ্সরা মেনকা দ্বারা তপোবনে রেখে যাওয়ার কথাও এখানে রয়েছে, যা খুবই অল্প কথায় প্রবন্ধে বর্ণিত হয়েছে। তপোবনের পরিবেশ পরিমন্ডলের বর্ণনায় যে বিশেষত্ব আমাদের কাছে ধরা পড়ে তা হল মালিনী নদী। যে নদীর কথা কালিদাসের মূল কাব্যেও পাওয়া যায় না। পাহাড়-পর্বত অরণ্যে ঘেরা ছোট নদী মালিনী, যার জলে প্রতিচ্ছবির মতো ফুটে উঠেছে সমগ্র তপোবনের আরণ্যক পরিবেশ। এপ্রসঙ্গে প্রাবন্ধিকের বর্ণনায় পাই-

> "মালিনীর জল বড় স্থির- আয়নার মতো। তাতে গাছের ছায়া, নীল আকাশের ছায়া, রাঙা মেঘের ছায়া- সকলি দেখা যেত। আর দেখা যেত গাছের তলায় কতগুলি কুটির ছায়া।"

অনুবাদক নদীর জলে ফুটিয়ে তুলেছেন কণ্বমুনির আশ্রমকে। নদীকে কেন্দ্র করে জীবনের যে প্রবাহ বাহিত হয়েছে তা নদীর পাড়ের জীবজন্তু- হাঁস, বক, টিয়া, হরিণ, কোকিল, ময়ূর ইত্যাদির উপস্থিতিতে প্রকাশিত। তারই সঙ্গে তিন হাজার বছরের পুরনো বটবৃক্ষের তলায় বিরাজিত কণ্বমুনির আশ্রম ও তাদের পোষাক পরিচ্ছেদ,

ঋষিকুমার ইত্যাদির প্রসঙ্গও রয়েছে। যার দ্বারা স্বল্প কয়েকটি বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সমগ্র তপোবনের সম্যক দৃশ্যাবলীকে প্রাবন্ধিক সুন্দর চিত্রের মতো আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

শকুন্তলাকে ছাড়া যে তপোবনের বর্ণনা অসম্পূর্ণ সে কথাও এই প্রবন্ধে রয়েছে। 'আঁধার ঘরের মানিক' শকুন্তলা, মা মেনকা দ্বারা পরিত্যক্তা। শকুন্তলার উপস্থিতিতে তপোবনে যেন আলো ফিরে এসেছে। মেনকার মধ্যে কোনো মায়া দয়া নেই। কারণ সে তার সদ্যোজাত সন্তানকে তপোবনে ফেলে চলে যায়। তবে বনের পশুপাখিদের মধ্যে সেই মায়া দয়া রয়েছে, যখন আমরা দেখতে পাই সারারাত পাখিরা শকুন্তলাকে আগলে রাখে নিজেদের ডানার নিচে। তাই লেখক মেনকাকে প্রবন্ধে 'পাষাণী' বলে উল্লেখ করেছেন। এরপর দেখা যায় ঋষিকুমাররা শকুন্তলাকে আশ্রমে নিয়ে যায় সেখানে প্রকৃতির অঙ্গ হয়ে শকুন্তলা বাল্য অতিবাহিত করে যৌবনে পদার্পণ করেছে।

কণ্বমুনির পিতৃসুলভ দায়িত্ববোধ এখানে বেশ প্রশংসনীয়। মেয়ের বয়স হলে তার জন্য পাত্র খুঁজতে বের হওয়ায় পিতার কর্তব্য প্রকাশ পায়। যেহেতু মেনকা কর্তৃক নিজ সন্তান তপোবনে পরিত্যক্ত হয় এবং তপোবনের মাতা গৌতমী, ঋষিকুমার পালিত হওয়ায় আপন হলো পর, আর পর হলো আপন, এই কথাটির ব্যাখ্যা খুবই সহজ সরলভাবে প্রাবন্ধিক এখানে তুলে ধরেছেন। এই বর্ণনায় তার নিজস্বতা খুঁজে পাই। কালিদাসের সুবৃহৎ কাব্যের কাহিনীমালাকে প্রাবন্ধিক ছোট ছোট বাক্য ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণতা দান করার চেষ্টা করেছেন। যেমন- শকুন্তলার তপোবনের জীবনাচরন, সখীদের সঙ্গে হাস্য-পরিহাস, রাজা দুষ্যন্তকে দেখা ও মাল্য প্রদান ইত্যাদি ঘটনাবলীকে নিজস্ব বর্ণনা ভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন, যা একবার অধ্যয়ন করলে সেই সুবৃহৎ কাব্যের সম্যক ধারণা আমাদের মনের গহনে ফুটে ওঠে।

রাজা দুষ্মন্তের বর্ণনাও খুবই অল্প পরিসরে রয়েছে। তিনি পৃথিবীর রাজা, বনের মধ্যে শিকার করতে এসেছেন। এই শিকার আসলে শকুন্তলা। রাজার যে চরিত্র তা তিনি সাধারণভাবেই বিশ্লেষণ করেছেন। ঘটনাক্রম খুবই কম, কেবল রাজার ঐশ্বর্য সোনা রূপার রথ, হাতি-ঘোড়া, সোনার রাজ্যপুরীর বর্ণনায় তা স্পষ্ট করেছেন। আর তপোবনের মল্লিকা ফুল ফোটার সাথেই রাজার শিকার যাওয়ার প্রসঙ্গ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মল্লিকা ফুল ফোটা আর শকুন্তলার যৌবন প্রস্ফুটিত হওয়া সম্পর্কযুক্ত। যাকে সমূলে তুলে নেওয়ার জন্য রাজার মন মৃগয়ায় আকৃষ্ট হয়। এই যে প্রতীকের সাথে অন্যান্য ঘটনাবলীকে যুক্ত করেছেন প্রাবন্ধিক তা এই অনুবাদকে বিশেষত্ব দান করেছেন।

ভাষা ব্যবহার

শকুন্তলার কাহিনী বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক যে পন্থা ব্যবহার করেছেন তা অত্যন্ত সহজ সরল মানুষের মুখের ব্যবহৃত ভাষা। ভাষা অনুধাবনে কোনো রকম জটিলতা এখানে প্রকাশ পায় না। বাক্যের ব্যবহারে সরলতার একটি উদাহরণ দেওয়া হল বনে রাজার শিকার পর্বে-

> "ফাঁদ নিয়ে ব্যাধ পাখির সঙ্গে ছুটল, তীর নিয়ে বীর বাঘের সঙ্গে গেল, জাল ঘাড়ে জেলে মাছের সঙ্গে চলল, রাজা সোনার রথে এক হরিণের সঙ্গে ছুটলেন।"

এখানে শিকারের যে দৃশ্য তাতে কোনো গুরুগম্ভীর ভাব প্রকাশ পায়নি। বরং সহজতার গুণে শিকার পর্ব আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। কিছু ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহার করেছেন যেমন 'ঝন্‌ঝনা', 'হট্ হট্', 'গুনগুন' প্রভৃতি শব্দগুলি। আবার মহাযোগী কণ্বের তপস্যার প্রতাপে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খাওয়ার প্রসঙ্গ নূতনত্বের ইঙ্গিত দেয়। কারণ এখানে কণ্বের স্নেহভাবের চেয়ে তার কাঠিন্যতার প্রকাশ বেশি প্রকটিত হয়। এক লাইনের বর্ণনে শকুন্তলা ও দুষ্যন্তের সাক্ষাৎ দর্শন ঘটালেন অনুবাদক। পৃথিবীর রাজা ও মাধবী কুঞ্জের রূপসী সম্মুখ দর্শনে যেন শিকার পর্ব

সম্পূর্ণতা পেল। তারপর দুষ্যন্তের নিদারুণ মনের পরিস্থিতি আর শকুন্তলার বিরহ ব্যথা প্রকাশিত। দুষ্যন্তের 'হা শকুন্তলা!', 'যো শকুন্তলা!' বলে বনে ঘুরে বেড়ানো, উভয়ের বিবাহ, রাজার রাজ্যে ফিরে যাওয়া ইত্যাদি অল্প কয়েকটি বাক্যেই বর্ণনা করা হয়েছে।

চরিত্র চিত্রণ

চরিত্রের আলোচনায় বলতে হয় এই অনুবাদের সমস্ত চরিত্রগুলি খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন কণ্ব মুনি, গৌতমী, অনসূয়া, প্রিয়ংবদা, শকুন্তলা, দুষ্মন্ত, মাধব্য, দুর্বাসা ঋষি প্রমুখ। মহর্ষি কণ্ব মুনির মনের পিতৃসুলভ আচরণ পিতা-মাতা হারা শকুন্তলাকে পিতৃস্নেহে পরিতৃপ্ত করে তুলেছে। তিনি শকুন্তলাকে নিজ কন্যার মতো লালন পালন করেছেন। সর্বদা বিভিন্ন বিষয়ে শকুন্তলাকে সঠিক পরামর্শদান করেছেন। ঋষি কুমাররা সকলে ভ্রাতৃরূপে এখানে উপস্থাপিত যারা শকুন্তলার সঙ্গে আশ্রমের পরিবেশে একই ভাবে বড় হয়েছে।

শকুন্তলা এই অনুবাদের কেন্দ্রীয় চরিত্র। সে আশ্রম কন্যা, তপোবনের আরণ্যক পরিবেশ তার জীবনযাপন, বেড়ে ওঠা, প্রকৃতির যে সরলতা গুণ তা শকুন্তলার মধ্যে বিশেষভাবে দেখা যায়। সহোদরদের সাথে, আশ্রমের ফুলেদের সাথে, হরিণ শিশুর সাথে, তার সখি অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার সাথে কথোপকথনে হৃদয়ের সঠিক ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে। প্রথম দর্শনে পৃথিবীর রাজাকে ভালোবেসে ফেলেছে, যার প্রমাণ রাজাকে পদ্ম পাতায় পত্র লেখা, রাজার জন্য কাঁদা ইত্যাদি প্রসঙ্গে শকুন্তলার মধ্যে কোনো ছলাকলা এখানে প্রকাশ পায়নি। তাই রাজা তাকে মাল্যদানে অর্থাৎ বিবাহে আগ্রহী হলে শকুন্তলাও রাজাকে মালা পরিয়ে দেয়। শকুন্তলার প্রেম বিশুদ্ধ হেম। রাজা তাকে বনে রেখে গেলে তার মধ্যে বিচ্ছেদের যে বেদনা প্রকাশ পেয়েছে তা দুষ্মন্তের প্রতি তার ভালবাসাকেই প্রমাণ করে। এই ভালোবাসার গভীরতা সাগর তুল্য, যার ফলে দুর্বাসার আগমনও সে অনুভব করতে পারেনা।

> "শকুন্তলার মুখে হাসি নেই, চোখে ঘুম নেই। রাজার ভাবনা নিয়ে কুটির দুয়ারে পাষাণ প্রতিমা বসে রইল।"

রাজা তার জন্য সোনার রথ পাঠাবে বলে ছিলেন। কিন্তু পৃথিবীর রাজা দুষ্মন্তের বনে ক্রীড়ার কথা সব ভুলে যান। অন্যদিকে দুর্বাসার অভিশাপ তার জীবনকে আরও দুঃখময় করে তোলে।

কণ্ব আশ্রমে এলে শকুন্তলা পতিগৃহে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। সেখানে শকুন্তলার প্রতি বন দেবতাদের স্নেহময় অনুভূতি ও তপোবনের জীবজন্তু পশু পাখির প্রতি শকুন্তলার সোদর স্নেহে তার চরিত্রে স্নেহ পরায়ণতা প্রকাশ পায়। শকুন্তলা চলে গেলে তখন আবার আঁধার হল তপোবন। রাজার প্রতি বিভোর শকুন্তলা প্রস্থান করার সময় জানতেই পারল না রাজার আংটিটি জলে পড়ে গেছে। পতির প্রতি প্রেমের গভীর পরাকাষ্ঠা-বোধ থেকে শকুন্তলার মধ্যে এরকম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখা গেছে।

রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে চিনতে না পারলেও শকুন্তলা কিন্তু কখনোই দুষ্মন্তকে অভিসম্পাত করে নি। বরং শান্ত মনোভাব নিয়ে সেখান থেকে চলে আসেন। শুধু যাবার আগে সেই সব সুখ স্মৃতিগুলি রাজাকে মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করে। আর প্রশ্ন করে শকুন্তলা বলে -

> "কিন্তু মহারাজ ,সোনার রথ কই পাঠালে, সব ভুলে রইলে? মহারাজ এমনি করে কি কথা রাখলে?"

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য রাজাকে তিনি দোষী করেননি। এরপর শকুন্তলাকে হেমকূট পর্বতে দেখা যায়। সেখানে তার সন্তান হয়, পরে রাজা দুষ্মন্ত তার কাছে ফিরে এলে তিনি রাজাকে ক্ষমা করে দেন এবং দুজনে আবার

তপোবনে ফিরে যান। হাজার দুঃখ কষ্টের মধ্যেও শকুন্তলা চরিত্রের এই মানসিক দৃঢ়তা তাকে আরো উজ্জ্বলতা দান করেছে। প্রথমে মাতার দ্বারা প্রত্যাখ্যান, পরে দুষ্যন্ত দ্বারা প্রতারিত তার মনকে কখনোই কলুষিত পরিপূর্ণ করেনি। বরং তাকে আরো মহিষী হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। তাই এই অনুবাদে শকুন্তলা চরিত্রটি অসাধারণত্ব লাভ করেছে।

দুষ্মন্ত চরিত্র এখানে দোষে-গুনে ভরা। তিনি পৃথিবীর রাজা, তপোবনে লীলা খেলা করতে এসেছে। তবে শিকার তার উদ্দেশ্য হলেও শকুন্তলার প্রতি তার প্রেম কোথাও সংকীর্ণতায় প্রচ্ছন্ন হয়নি। শকুন্তলাকে দেখে যে ভাব তার মধ্যে প্রকট হয়েছে তা যথার্থ প্রেমিক পুরুষের চরিত্রের প্রকাশ, লাম্পট্য ভাবে তিনি শকুন্তলাকে পেতে চাননি; তাই দুষ্যন্ত তাকে বিয়ে করেছেন। পৃথিবী রাজা শকুন্তলাকে যথার্থই ভালোবেসে ফেলেছিলেন যার ফলে রাজা তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিলেন যে সোনার রথ তাকে তপোবনে নিতে আসবে। কিন্তু দুর্বাসার অভিশাপে তিনি সব ভুলে ছিলেন।

রাজসভায় যখন শকুন্তলাকে চিনতে পারেননি তখনও দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রতি কোন অন্যায় আচরণ করেননি। বরং সহৃদয়তার ভাব প্রকাশ পেয়েছে। দুষ্যন্ত বলেছেন-

"কন্যে তুমি কেন এসেছো? কি চাও? টাকা কড়ি চাও না, ঘরবাড়ি চাও? কি চাও?"

মহারাজার রাগান্বিত মনের পরিচয় ঘটেনি, তার পরিবর্তে দানশীল মনের পরিচয় দিয়েছেন। পরিশেষে আংটি ফিরে পেয়ে শকুন্তলাকে মনে পড়লে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছেন এবং হেমকূট পর্বতে শকুন্তলাকে দেখে তিনি খুশি মনে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন। দুষ্মন্ত চরিত্রটি এখানে আমাদের হৃদয় জয় করে নিয়েছে, কারণ একদিকে তিনি বীর পরাক্রম রাজা যুদ্ধে দানবদের পরাস্ত করেছেন অন্যদিকে গভীর ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকেও তিনি পরিশেষে শকুন্তলাকে পেয়ে আনন্দিত হয়ে রাজ্য ছেড়ে তপোবনে কণ্বমুনির আশ্রমে গিয়ে বাকি জীবন অতিবাহিত করার মনস্থ করেছেন। এখানে তার চরিত্রের মহত্ব ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে।

চিত্রকল্প

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পী মানুষের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এই অনুবাদের মধ্য দিয়ে। তিনি বর্ণনার মধ্যে যে প্রতিচ্ছবিকে প্রকাশ করেছেন, তা আমাদের সাক্ষাৎ চক্ষুদর্শন করায়, অর্থাৎ চিত্রকল্পের ব্যবহার এই অনুবাদকে অনেক বেশি প্রাণোজ্জ্বল করে তুলেছে। যেমন তপোবনের বর্ণনা -

"নদীতীরে যে নিবিড় বন ছিল তাতে অনেক জীবজন্তু ছিল। কত হাঁস, কত বক সারাদিন ধরে বিলের জলে ঘুরে বেড়াতো। কত ছোট ছোট পাখি কত টিয়া পাখির ঝাঁক গাছের ডালে ডালে গান গাইত, কোটরে কোটরে বাসা বাঁধত।"

এখানে চিত্রকল্পের ব্যবহার করে সমগ্র তপোবনের আশ্রমিক পরিবেশকে ছবির মতো আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আবার রাজা দুষ্মন্তের শিকার পর্বের বর্ণনা তিনি চিত্রকল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন। এছাড়া শকুন্তলা যখন রাজপ্রাসাদে উপস্থিত তখন শকুন্তলার চোখ দিয়ে আমাদের দুষ্মন্তের রাজত্বের দর্শন ঘটে। যেমন-

"প্রথম মহলে রাজসভা, সেখানে সোনার থামে সোনার ছাদ। তার তলায় সোনার সিংহাসন, সেখানে দোষী নির্দোষের বিচার চলছে।"

এইভাবে দেবমন্দির নৃত্যশালা, সঙ্গীতশালা ও রাজসভার চিত্রিত ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এরই সাথে অনূদিত

হয়েছে কয়েকটি অঙ্কিত ছবি যা দেখে আমরা সামাজিক ঘটনাবলীকে চিরকালীন করে তুলতে পারি। যার ফলে সমগ্র অনুবাদটি কাহিনী রচনার পারিপাট্যে, চরিত্র চিত্রণের অভিনবত্বে, ভাষা ব্যবহারের সারল্যে এবং চিত্রকল্পের প্রয়োগে সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছে।

৪১২.২.৬.২ : সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর

১. 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নাটকের চতুর্থ অঙ্কে শকুন্তলার বেদনাময় বিদায়দৃশ্যে তপোবন-প্রকৃতি ও মানব-প্রকৃতি কীভাবে অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তা আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও।

২. 'দেসদিমোনার হৃদয় আমাদিগের সম্মুখে সম্পর্ণ উন্মুক্ত এবং সম্পূর্ণ বিস্তারিত; শকুন্তলার হৃদয় কেবল ইঙ্গিতে ব্যক্ত'।— বঙ্কিমচন্দ্রের 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেসদিমোনা' প্রবন্ধ অনুসরণে উদ্ধৃতির বিশ্লেষণ করো।

৩. 'টেম্পেস্টে শক্তি, শকুন্তলায় শান্তি; টেম্পেস্টে বলের দ্বারা জয়, শকুন্তলায় মঙ্গলের দ্বারা সিদ্ধি; টেম্পেস্টে অর্ধপথে ছেদ, শকুন্তলায় সম্পূর্ণতায় অবসান।'- প্রাবন্ধিকের অনুসরণে মন্তব্যটি যথাযথ ব্যাখ্যা করো।

৪. 'শেক্সপীয়রের এই নাটক সাগরবৎ, কালিদাসের নাটক নন্দনকাননতুল্য'।— কোন দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন তা বুঝিয়ে দাও।

৫. 'শকুন্তলার সরলতা স্বভাবগত এবং মিরন্দার সরলতা বহির্ঘটনাগত'- এই মন্তব্যের আলোকে শকুন্তলা ও মিরন্দা দুটি চরিত্রকে বিশ্লেষণ করো।

৬. শকুন্তলা নাটকের চতুর্থ অঙ্কে অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা চরিত্র দুটি শকুন্তলাকে কীভাবে সম্পূর্ণতা দিয়েছে ? নাটকে তাদের গুরুত্ব বিচার করো।

৭. 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নাটকে ঋর্ষি দুর্বাশার অভিশাপের গুরুত্ব কতখানি তা আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও।

৮. বিদ্যাসাগর ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর দুজনেই কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' অনুবাদ করেছেন, কিন্তু দুজনের অনুবাদের অভিমুখ ভিন্ন- আলোচনা করো।

৯. 'কালিদাসের শকুন্তলা তরুণ বয়সের ফুল ও পরিণত বয়সের ফল'- গ্যেটের এই মন্তব্যকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'শকুন্তলা' প্রবন্ধে কতটা সমর্থন করেছেন তা প্রবন্ধ অবলম্বন আলোচনা করো।

১০. অনুবাদ সাহিত্য সম্পর্কে তোমার ধারণা ব্যক্ত করে অবনীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা' গ্রন্থটি কতটা তুলনামূলক সাহিত্যধারাকে রক্ষা করেছে তা আলোচনা করো।

পত্র : বি-কোর-৪১২

তুলনামূলক সাহিত্য

পর্যায় গ্রন্থ : ২

একক-৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'প্রাচীন সাহিত্য'এর 'শকুন্তলা'

বিন্যাসক্রম :

৪১২.২.৫.১ : প্রস্তাবনা

৪১২.২.৫.১ : প্রস্তাবনা

'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থে 'শকুন্তলা' শীর্ষক যে প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করেছেন তাও তুলনামূলক সাহিত্যের অন্তর্গত। 'প্রাচীন সাহিত্যে'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-

"প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা-পূজার আবেগ মিশ্রিত ব্যাখ্যা।"

'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থে একের পর এক বিভিন্ন প্রাচীন কাব্য সাহিত্য এবং চরিত্রের এমন বর্ণনা যা অত্যন্ত সরস এবং গ্রহণযোগ্য বিশ্লেষণ হয়ে উঠেছে যা আমাদের হৃদয়ে চিরস্থায়ী আসন গ্রহন করে।

শেক্সপিয়ারের 'টেম্পেস্ট' নাটকের সঙ্গে কালিদাসের 'শকুন্তলা'র তুলনা সহজেই মনে আসে। নির্জন লালিতা মিরান্দার সঙ্গে রাজকুমার ফার্দিনান্দ এর প্রণয়ের সঙ্গে শকুন্তলার সঙ্গে দুষ্মন্তের প্রণয়ের সাদৃশ্য আছে। নাটকের ঘটনাস্থলটিও একটি তপোবন এবং অন্যটি সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আলোচনায় দেখিয়েছেন যে দুটি নাটকের বাহ্যিক সাদৃশ্য থাকলেও অভ্যন্তরীণ রসবিচারে দুটি নাটক সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের। মহাকাব্য গ্যেটের একটি অমোঘ মন্তব্য তিনি উল্লেখ করেছেন,

> "কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, কেহ যদি মর্ত্য ও স্বর্গ একত্রে দেখিতে চায় তবে শকুন্তলায় তাহা পাইবে।"

গ্যেটের এই উক্তি রসজ্ঞের বিচার। রবীন্দ্রনাথ বলেন, শকুন্তলার মধ্যে একটি গভীর পরিণতির ভাব আছে, তা ফুল থেকে ফলে পরিণতি, মর্ত্য হইতে স্বর্গে পরিণতি এবং তা মানুষের স্বভাব থেকে ধর্মে পরিণতি। এ যেন সব

কাব্যকে এক লোক থেকে অন্য লোকে নিয়ে যাওয়া। প্রেমকে স্বভাব সৌন্দর্যের দেশ থেকে মঙ্গল সৌন্দর্যের অক্ষয় স্বর্গধামে উত্তীর্ণ করেছেন নাট্যকার। প্রথম অঙ্ক থেকেই শকুন্তলার প্রকৃতিপেলব স্বভাব সৌন্দর্য এবং সরলতাকে স্পষ্ট করেছেন নাট্যকার। শকুন্তলা তপবনের হরিণীর মতো, বিদ্ধ হতে তার দেরী হয়নি। শকুন্তলা প্রকৃতির মতো অনাবৃত, তবু সে নিজের নির্মলতা রক্ষা করে চলে। সে স্বভাব ধর্মের অনুগতা। কালিদাস তার প্রিয় চরিত্রকে লীলা ও ধৈর্য্যের নদী ও সমুদ্রের ঠিক মাঝখানে মোহনার উপর স্থাপন করেছেন। তাঁর পিতা ঋষি, মাতা অপ্সরা। ব্রতভঙ্গে তাঁর জন্ম, তপোবনে তাঁর পালন। তপোবন স্থানটি এমন সেখানে সমাজের অনুশাসন এবং প্রকৃতির সৌন্দর্য মিলিত হয়েছে। সেখানে সমাজের কৃত্রিম বিধান নেই, অথচ ধর্মের কঠোর নিয়ম বিরাজিত। গান্ধর্ব বিবাহও তেমনি, স্বভাবের উদ্যমতা আছে, বিবাহের সামাজিক বন্ধনও আছে। শকুন্তলার মধ্যে দুই বিপরীত ধর্মের মিলন আছে।

কিন্তু 'টেম্পেস্ট'এ এভাবটি নেই। মিরান্দা কেবল পিতার সাহচর্যে বড়ো হয়েছে তার হৃদয় প্রকৃতি তাই স্বাভাবিক ভাবে বিকাশলাভ করেনি। কিন্তু শকুন্তলার স্বাধীনতা তাকে জীবন সম্পর্কে অবহিত করেছিল, তার স্বভাবে তাই লজ্জা ছিল সে সংসারে কিছুই জানেনা তা নয়, কারণ তপোবন সংসারের বাইরে নয়। সে লজ্জা করতে শিখেছে, সে অজ্ঞ নয়, অনভিজ্ঞ। মিরান্দার সরলতা অগ্নিপরীক্ষা হয়নি, কিন্তু শকুন্তলার সরলতার পরীক্ষা আমরা দেখতে পাই এবং সেই সরলতা পবিত্রতম। সে অরণ্যে প্রতিপালিতা তাই সহজে সে মলিন হয়না, অরণ্যের মুক্ত জলধারার মতো সে নির্মল। বাইরের কোন অভিজ্ঞতা যে তাকে স্পর্শ করতে পারেনি তা নাটকে আমরা দেখতে পাই।

দুটি নাটক পাশাপাশি রাখলে তাতে সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্যই বেশী তা স্পষ্ট। তবে এই অমিলগুলি থেকে নাটক সম্পর্কে আমরা একটা স্পষ্ট ধারণা পেতে পারি। 'টেম্পেস্ট' নাটকে মিরান্দার বাস নির্জন দ্বীপে। সেই দ্বীপের সহিত তার কোন একাত্মতা পরিলক্ষিত হয়না। কিন্তু শকুন্তলাকে তপোবনের দূরে রাখলে সে হবে অসম্পূর্ণ। আসলে শকুন্তলা মিরান্দার মতো স্বতন্ত্র নয়, সে তার চারপাশের পরিবেশের সাথে একাত্ম ভাবে মিশে আছে। কালিদাস আসলে বিশ্বপ্রকৃতি তথা আশ্রম প্রকৃতিকে শকুন্তলা চরিত্রের মধ্যে সমর্পিত করেছেন। তাই শকুন্তলাকে তার কাব্যময় পরিবেশ থেকে ছিন্ন করা কঠিন।

মূলত প্রণয় আর ফার্দিনান্দের মধ্যেই মিরান্দা স্বয়ংসম্পূর্ণা। কিন্তু শকুন্তলার পরিচয় এত সংক্ষিপ্ত নয়, সে প্রকৃতির প্রতিটি কণার সঙ্গে একাত্ম। শুধুমাত্র দুষ্মন্তের মধ্যে সে পূর্ণ নয় বরং তপোবনের প্রতিটি তরু ও পশুপাখিদের সে নিজ স্নেহ ভালোবাসা দ্বারা নিবিড় বন্ধনে বেঁধে রেখেছিল। তাই তপোবন ছেড়ে পতিগৃহে যাওয়ার সময় প্রকৃতি ও প্রাণীরা পদে পদে তার পিছুটান পরিণত হয়েছে ও তাকে বেদনা দ্বারা অভিষিক্ত করেছে। টেম্পেস্টে পীড়ন, শাসন, দমন, আছে; আর শকুন্তলায় আছে প্রীতি, শান্তি ও সদ্ভাব। টেম্পেস্টে প্রকৃতি থাকলেও তা হৃদয় সম্পর্কে আবদ্ধ নয়, কিন্তু শকুন্তলায় গাছপালা-পশুপাখি মানুষের সঙ্গে আত্মীয় ভাবে মিলিত হয়েছে। বনের সহিত মানুষের বিচ্ছেদ যে এমন করুণ হতে পারে তা একমাত্র কালিদাসই তাঁর "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" এর চতুর্থ অঙ্কে অঙ্কিত করলেন। কবিবর কালিদাসের সৃষ্ট এই মিলন প্রকৃতি ও মানুষের মিলন, যে মিলনগাথা বোধকরি ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোন দেশে সম্ভব নয়।

শকুন্তলার আরম্ভে ঋষির বক্তব্য—

"মৃদু এ মৃগদেহে
মেরো না শর।
আগুন দেবে কে হে
ফুলের"পর।"

এই কথা আসলে শকুন্তলার উদ্দেশ্যে বলা। আশ্রম মৃগ যেমন আদরণীয় ও রক্ষণীয়, শকুন্তলাও তেমনি। ঋষির এই বাক্যের পরই আমরা সখীদের সঙ্গে দেখি বল্কলবসনা- তাপসকন্যা প্রাত্যহিক কাজে নিযুক্তা শকুন্তলাকে। নাটকের শুরুতেই আমরা একটি শুদ্ধ নারী প্রতিমূর্তি দেখি শকুন্তলার মধ্যে। কিন্তু দুষ্মন্তের বিদ্ধ করা বাণ যখন প্রাণীদের এসে লাগে তখন সমগ্র তপোবনের ক্রন্দন আমরাও শুনতে পাই। আবার শকুন্তলার বিদায়কালে সমগ্র তপোবনের প্রকৃতি আবারও কেঁদে ওঠে, কেঁদে ওঠে শকুন্তলাও। আসলে এ নাটকে প্রকৃতি আর শকুন্তলা কখনই অভিন্ন নয়। এখানকার অন্যান্য চরিত্রের মতোই কবি প্রকৃতিকেও এক চরিত্র হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন। বর্তমান সভ্যতায় যেখানে মানুষ গাছপালা এবং প্রকৃতিকে প্রকৃত রেখে এমন সজীব, প্রত্যক্ষ, ব্যাপক, অন্তরঙ্গভাবে তাকে সাহিত্যে অঙ্গীভূত করা তা কালিদাসের পক্ষেই সম্ভব। উত্তরচরিতে সীতার মধ্যে প্রকৃতির জন্য এমন আকুতি লক্ষ্যণীয়।

টেম্পেস্টে মানুষ নিজেকে বিশ্বের সঙ্গে একযোগে স্থাপিত করেনি বরং বিশ্বকে দমন-পীড়ণের দ্বারা সে আপনার বশ করতে চেয়েছে, নিজে হতে চেয়েছে অধিপতি। আসলে স্বরাজ্য থেকে প্রতারিত হওয়া এবং পরবর্তীতে রাজ্য হস্তগত করা এই হলো টেম্পেস্টের মূল বিষয়। প্রকৃতি এখানে দানবরূপী, তার নখাগ্রে সঞ্চিত বিষ। 'টেম্পেস্ট' নাটকের সর্বত্রই বিক্ষোভ। সে বিরোধ মানুষে-মানুষে এবং মানুষ-প্রকৃতিতেও। কিন্তু আমাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি কখনই প্রতিশোধ সমর্থন করে না, সে সর্বদা মঙ্গলাকাঙ্খী। সে চায় প্রেম দ্বারা, সৌন্দর্যের দ্বারা ভিতরের পাপকে বিলীন করতে। কালিদাসও সেই শুভত্ব দ্বারা পরিচালিত হয়ে দুরন্ত প্রবৃত্তির দাবদাহকে শান্ত নির্ঝরিণী অশ্রু দ্বারা নির্বাপিত করেছেন। তিনি জীবনের সর্বত দুঃখকে সুখের দ্বারা আচ্ছন্ন করেছেন। তবে সেই আবরণে তিনি কিছুটা ছিদ্রও রেখেছেন। সে ছিদ্র হলো শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান। পঞ্চম অঙ্কের শুরুতে রাজার চপল প্রণয় নিরর্থক নয়, বরং তাতে স্বভাবের বীজ রোপণ করেছেন লেখক। এই অঙ্কের শুরুতেই লেখক আমাদের প্রস্তুত করে রাখলেন আসন্ন কান্ডের প্রত্যাঘাত সহ্য করার জন্য। তারপর অকস্মাৎ আঘাত এনে কবি শকুন্তলাকে মৃগীর নেত্রের দৃষ্টি দান করলেন। তপোবনে যেন অগ্নি বর্ষিত হল। যার প্রভাবে চতুর্দিকে কী গম্ভীরতা, বিরলতা। যে শকুন্তলা সমগ্র তপোবনের প্রাণীদের একত্র নিয়ে বাস করতো সে আজ কী ভীষণ একাকী। শকুন্তলার এই নিভৃত, একাকী অবস্থানে কবিও আজ নীরব।

এরপর দুষ্মন্তেরও তপস্যার ব্যবস্থা করলেন কবি। এক ভীষণ তপস্যার মধ্যে দিয়ে শকুন্তলাকে না পেলে তাকে লাভ করার সার্থকতা কোথায়! আসলে শকুন্তলার স্বভাব গুণেই দুষ্মন্ত তাকে লাভ করেছে, সে দুষ্মন্তেরও সৌভাগ্য। এভাবে কালিদাস দুষ্মন্তকে দারুণ হৃদয় অনলে পুড়িয়ে তাকে শকুন্তলার যোগ্য হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। যেখানে পাঠকও সংশয়হীন হয়ে পরিপূর্ণ পরিণতির মধ্যে শান্তিলাভ করেছেন।

অপরদিকে, 'টেম্পেস্টে' ফার্দিনান্দের প্রেমকে প্রস্পেরো কৃচ্ছসাধন দ্বারা পরীক্ষা করিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু তিনি কালিদাসের মতো লোহা পুড়িয়ে সোনা বানিয়ে নেননি। শকুন্তলাকে প্রথমে আমরা তপোবনরূপ স্বর্গে বাস করতে

দেখি, কিন্তু সেই স্বর্গে অচিরেই পাপ প্রবেশ করে বা স্বর্গপারিজাত কীটদ্রষ্ট হয়। তবে সেই স্বর্গে পুনরায় শান্তির প্রতিষ্ঠা হয়। শকুন্তলাকে একত্রে paradise Lost এবং Paradise Regained বলা যেতেই পারে।

কবি এইভাবে বাইরের শান্তি ও সৌন্দর্যের কোথাও লেশমাত্র খামতি না রেখে তাঁর কাব্যের অভ্যন্তরীণ শক্তিকে নিস্তব্ধতার মধ্যে সর্বদা সক্রিয় ও সবল করে রেখেছেন। এমনকী তাঁর বহিঃপ্রকৃতি সর্বদাই অন্তরের কাজে নিমজ্জিত। শকুন্তলা এখানে যতই সজীব চরিত্র হোক না কেন, তপোবন তথা প্রকৃতি যেন এখানে আপন কাজে ব্যাপৃত, নিজেই একটি চরিত্র সে প্রকৃতি কখনই টেম্পেস্টের এরিয়েলের মতো শাসনবদ্ধ, দাসত্বের প্রতিরূপ নয়।

অতএব, টেম্পেস্টে শক্তি, শকুন্তলায় শান্তি, টেম্পেস্টে বলের দ্বারা জয়, শকুন্তলায় মঙ্গলাকাঙ্খার দ্বারা সিদ্ধি, টেম্পেস্টে অর্ধপথে ছেদ, শকুন্তলা স্বয়ংসম্পূর্ণা। মিরান্দার সরলতা অজ্ঞতা-অনভিজ্ঞতার উপরে। শকুন্তলার সরলতা অপরাধে, দুঃখে, অভিজ্ঞতায়, ধৈর্য্যে ও ক্ষমায় পরিপক্ক গম্ভীর। গ্যেটের সমালোচনার অনুসরণে বলা যায়, শকুন্তলা নিজ সরলতা দিয়ে মর্ত্যকে স্বর্গের সঙ্গে সম্মিলিত করেছে।

পত্র : বি-কোর-৪১২

তুলনামূলক সাহিত্য

পর্যায় গ্রন্থ : ৩

একক-১

মেঘদূত (পূর্বমেঘ) : কালিদাস

বিন্যাসক্রম :

৪১২.৩.১.১ : মেঘদূত : প্রাক্‌কথন

৪১২.৩.১.২ : মেঘদূত : কালিদাস প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

৪১২.৩.১.১ : মেঘদূত : প্রাক্‌কথন

কবি কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের উপস্থাপিত বিষয় ও বক্তব্য সম্পূর্ণ রূপে মৌলিক। প্রাচীন ভারতে কমবেশি দেড়হাজার বছর আগে এই আখ্যানকাব্য বা খণ্ডকাব্য লেখা হয়েছিল। প্রভু কুবেরের অভিশাপে এক যক্ষকে এক বছরের জন্য নব পরিণীতা বধূর সান্নিধ্য ছেড়ে অলকা থেকে রামগিরি পর্বতে নির্বাসন যাপন করতে হয়েছিল। তার নির্বাসনের আটমাস অতিক্রান্ত হলে বর্ষার আগমনে পর্বত চূড়ায় জলভারাবনত মেঘ সঞ্চারিত হতে দেখে যক্ষের মনে প্রিয়ামিলনের আকাঙ্ক্ষা জাগে। আর এই আকাঙ্ক্ষার ফলশ্রুতিতে প্রবল আবেগে সে মেঘকে চেতন বস্তু মনে করে তার প্রিয়ার কাছে বার্তা নিয়ে যাবার জন্য মেঘকে অনুরোধ করেছে। যক্ষের নির্বাসনকাল শেষ হতে আর চারটি মাস বাকি শরৎ-পূর্ণিমায় তাদের পুনর্মিলন হবে। এই প্রিয় বার্তা প্রিয়ার কাছে নিয়ে যাবার জন্য সে মেঘকে অনুরোধ করে। আর এই বার্তা নিয়ে যাবার জন্য যক্ষ মেঘকে রামগিরি থেকে অলকাপুরী পর্যন্ত পথের দিশা বলে দেয়। এই রামগিরি থেকে অলকাপুরী পর্যন্ত মেঘের যাত্রা পথের বিবরণ আছে পূর্বমেঘ-এ; আর যক্ষপ্রিয়া ও অলকাপুরীর সৌন্দর্যচিত্র আছে উত্তরমেঘ-এ। মেঘদূত কাব্য কালিদাসের বেদনা থেকে নয়, যক্ষের মনোবেদনা থেকে জন্মলাভ করেছে। একথা স্বীকার করতে হয় যে মেঘদূত একালের আমাদের নিঃসঙ্গ মনের সঙ্গী হয় এবং যক্ষের মনোবেদনা আমাদের মনের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। কালিদাস বলেন—

তস্য স্থিত্বা কথমপি পুরঃ কৌতুকাধানহেতো-
রন্তর্বাষ্পশ্চিরমনুচরো রাজরাজস্য দধ্যৌ।

মেঘালোকে ভবতি সুখিনোহপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি জনে কিং পুনর্দূরসংস্থে।।

অর্থাৎ কামনার উদ্রেককারী সেই মেঘের সামনে কোনও প্রকারে অশ্রুরোধ ক'রে কুবেরের অনুচর যক্ষ বহুক্ষণ ভাবল। মেঘ দেখলে সুখি মানুষের মনও বিকারযুক্ত হয়। কণ্ঠালিঙ্গনকামী জন দূরে থাকলে তো কথাই নেই। মেঘদূত কাব্যে সর্বকালের মানুষের স্বপ্ন ও বেদনা লুকিয়ে আছে বলে এই কাব্যের এত বিস্তার ঘটেছিল।

৪১২.৩.১.২ : মেঘদূত : কালিদাস প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

তর্কসাপেক্ষভাবে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই কালিদাস আলোচনার নতুন পথ নির্মাণ করেছেন। শকুন্তলা, কুমারসম্ভব ও মেঘদূত—এই তিনটি গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ বেশ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। কালিদাসের মধ্যে দিয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষের জনজীবন, নর-নারীর চরিত্র, প্রেমের স্বরূপ প্রভৃতি তিনি উপলব্ধি করেছেন। আর সেই আদর্শকেই ভারতের জীবন ও সাধনার অন্তরকথা বলে গ্রহণ করেছেন। সেজন্য বাল্মীকি-ব্যাসকে বাদ দিলে চিরায়ত রচনাকারদের মধ্যে তিনি কালিদাসকে শ্রেষ্ঠ বলে মেনেছেন।

কালিদাসের মেঘদূত কাব্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের হৃদয়ের ছায়া লক্ষ করেছিলেন। তিনি নিবিড় ভাবে অনুভব করেছিলেন—তুমুল বর্ষার ঘনঘোর দিনে প্রিয়া—বিরহকাতর যক্ষের মতো প্রত্যেক মানুষ প্রিয়ের জন্য অনন্ত বিরহের সম্মুখীন হয়। রবীন্দ্রনাথ এই বেদনারসের মধ্য দিয়ে মেঘদূত কাব্যপাঠের অনবদ্য রসভোগ করেছেন। তিনি বর্তমান কালের পাখায় ভর করে অতীত যুগে পৌঁছেছেন এবং কোন-এক বিরহী যক্ষের মনোবেদনাকে বিশ্বমানবের আর্ত আকুলতার মধ্যে উপলব্ধি করেছেন। কালিদাসের অন্যান্য কাব্য-নাটক তাঁকে মুগ্ধ করলেও, মেঘদূত তাঁর সমগ্র সত্তাকে যেভাবে আলোড়িত করেছে; অন্য কোনো দেশি-বিদেশি কাব্য তাঁকে এতটা মুগ্ধ ও আলোড়িত করেনি। তাঁর গদ্যনিবন্ধ, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, ডায়েরি ও কবিতায় মেঘদূত প্রসঙ্গ বার বার এসেছে। যে সব রবীন্দ্র-সৃষ্টিতে মেঘদূত প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে তার একটি কালানুক্রমিক তালিকা করা যেতে পারে—

ক) মেঘদূত—(কবিতা) মানসী, ১৮৯০
খ) চিঠিপত্রে মেঘদূতের প্রথম উল্লেখ, ১৮৯০
গ) মেঘদূত—(প্রবন্ধ) প্রাচীন সাহিত্য, ১৮৯২
ঘ) মেঘদূত—(সনেট) চৈতালি,১৮৯৬
ঙ) নববর্ষা—(প্রবন্ধ) বিচিত্র প্রবন্ধ, ১৯০১
চ) বাজে কথা—(প্রবন্ধ) বিচিত্র প্রবন্ধ ১৯০১
ছ) শ্রাবণ সন্ধ্যা—(প্রবন্ধ) শান্তিনিকেতন, ১৯১০
জ) মেঘদূত—(কথিকা) লিপিকা, ১৯২২
ঝ) বিচ্ছেদ—(কবিতা) পুনশ্চ, ১৯৩২
ঞ) যক্ষ—(কবিতা) ঐ, সংযোজন ১৯৩৩
ট) যক্ষ—(কবিতা) সানাই, ১৯৩৮

এই সারণির তিনটি পাঠ (মেঘদূত প্রাচীন সাহিত্য, মেঘদূত চৈতালি, যক্ষসানাই) এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের যক্ষের নিবেদন কবিতাটিকে কালিদাসের মেঘদূতের আলোকে তুলনামূলক বিশ্লেষণ-ই আমাদের অভিপ্রায়।

পত্র : বি-কোর-৪১২

তুলনামূলক সাহিত্য

পর্যায় গ্রন্থ : ৩

একক-২

রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্য-র মেঘদূত (প্রবন্ধ)

বিন্যাসক্রম :

৪১২.৩.২.১ : রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্য-র মেঘদূত (প্রবন্ধ)

৪১২.৩.২.১ : রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্য-র মেঘদূত (প্রবন্ধ)

সাহিত্য পত্রিকায় ১৮৯২ সালে মেঘদূত প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বিশুদ্ধ রসের, আনন্দ ও সৌন্দর্যের দিক থেকে কালিদাসের মেঘদূত কাব্যকে বিশ্লেষণ করেছেন। তবে মনে রাখতে হবে কাব্যের রসভোগ-ই কবির মূল উদ্দেশ্য এবং সেজন্য তিনি মেঘদূতকে নতুন করে নির্মাণ করেছেন। মেঘদূত কাব্য পাঠের পর কবির মনে বর্ষার বেদনার যে ব্যক্তিগত অনুভূতি জেগেছিল তাকেই কবি গদ্যনিবন্ধের আকারে প্রকাশ করেছেন। এক বর্ষণমুখর অপরাহ্নে এই কাব্য পাঠের সঙ্গে সঙ্গে কবির মনও উধাও হয়ে গেছে কালিদাসের কালে। মন্দাক্রান্তা ছন্দের পাখায় ভর করে তাঁর মন মেঘের সঙ্গী হয়ে দশার্ণ-অবন্তী-বিদিশা-উজ্জয়িনীর ভূ-সন্ধান করেছে। কালিদাসের দেশ-কাল-পাত্র কিছুই আর নেই; কিন্তু রূপান্তরিত নামে ভৌগোলিক অস্তিত্ব আছে। বেত্রবতী হয়েছে বেতোয়া, উজ্জয়িনি হয়েছে উজৈন, বিন্ধ্য হয়েছে ভিন্ধ্। আর এই কারণে বর্তমানের ইতর কলকাকলি থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য তিনি রেবা-শিপ্রা-অবন্তী-বিদিশার মধ্যে প্রবেশের পথ খুঁজেছেন। কিন্তু সেখান থেকে তো আমরা নির্বাসিত। একমাত্র মেঘের সঙ্গী হয়ে এবং কালিদাসের শ্লোক সম্বল করে আমরা রামগিরি থেকে অলকা পর্যন্ত মানসভ্রমণ করতে পারি। কারণ কালিদাসের কাব্য ছাড়া আর কোনো উপায়েই সেই গন্ধর্ব কিন্নর লোকে যাবার উপায় নেই।

এই প্রবন্ধের প্রথম তিন অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কালেই পরিভ্রমণ করেছেন এবং কালিদাস বর্ণিত নিসর্গ-প্রকৃতির মধ্যে বিচরণ করেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন, কালিদাসের যুগ বহু শতাব্দী পূর্বে অন্তর্হিত হয়েছে, একমাত্র তাঁর কাব্য উপভোগ করেই সেকালের কিছু কাল্পনিক স্বাদ পেতে পারি।প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে এই অংশে রবীন্দ্রনাথের বর্ণনাকৌশল ও চিত্ররচনার গুণে প্রবন্ধটি একটি নতুন সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে। হর্ম্যবাতায়নে পুরবধূদের কেশসংস্কার, অন্ধকার রাত্রে ভবনশিখরে সুপ্ত পারাবত, নির্জন সুষুপ্ত রাজপথ এবং সেই অন্ধকার পথে

কম্পিত হৃদয়ে অভিসারিকার নিঃশব্দ যাত্রা কবিকে দূরকালে টেনে নিয়ে গেছে। তাঁর বাসনা যেন মূর্তি ধরে সেই অভিসারিকার 'পায়ের কাছে নিকষে কনকরেখার মতো' শুধু আলো জ্বালতে চেয়েছে। যক্ষের মেঘ উড়ে চলেছে উত্তরে, নদনদী নগরীর উপর দিয়ে, তৃষ্ণাতপ্ত যুথীবনে ক্ষণিক বর্ষণ করে, জনপদবধূদের প্রীতিস্নিগ্ধ ভ্রূবিকারহীন সরল দৃষ্টির প্রসাদ নিয়ে, ঊষর ক্ষেত্রে সবুজের বীজ বপন করেতার সঙ্গে সঙ্গে কবিও যেন মেঘবাহনে যাত্রা করেছেন। প্রকৃতি রূপক না হয়ে হয়েছে রূপময়। বসন্ত প্রকৃতির মধ্যে আছে মত্ততা, আবেগ, রক্তিম বিহ্বলতা। মধুদেবতা তখন জীবজগতে মানসিক বিকার সঞ্চার করে, মানুষ চঞ্চল হয়, সীমা ছিঁড়তে চায়, উত্তপ্ত উল্লাসে নিজেকে ভেঙে চুরে ফেলতে চায়। কিন্তু বর্ষা বয়ে নিয়ে আসে শ্যামস্নিগ্ধতা, অকারণ বেদনা। কাছের চেয়ে দূরের ডাক মন ভরিয়ে দেয়। মেঘদূত কাব্য পাঠ করে রবীন্দ্রনাথের মনে সেই অপূর্ণ আবেগের আকাঙ্ক্ষা জেগেছে, তিনিও কালিদাসের কবিসংস্কারের অংশীদার হয়েছেন।

প্রবন্ধটির চতুর্থ অনুচ্ছেদ থেকে বর্ণনা উপলব্ধিগোচর তত্ত্বানুভূতির দিকে মোড় নিয়েছে। যক্ষ ও যক্ষপ্রিয়ার মাঝে অনন্ত বিরহ-বারিধির অশান্ত কল্লোল। কোথায় রামগিরি আর কোথায় বা কামনার মোক্ষধাম অলকা। দু'জনে যেন সেই অশ্রুলবনাক্ত সমুদ্রগর্ভে দুই বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো একে অপরের দিকে চেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে। তবে আশা এইটুকু বর্ষাকাল নির্বাসন ভোগের পর দম্পতি আবার মিলিত হবে। দুজনের বিরহব্যবধান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ম্যাথু আর্নল্ডের Isolation কবিতাটির প্রসঙ্গ তুলেছেন। কবিতাটিতে আর্নলড্ বলেছেন যে, আমরা জীবনসমুদ্রের গর্জমান তরঙ্গের মধ্যে দ্বীপের মতো একাকী বাস করছি, আমাদের চারিদিকে কূলহীন সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ। আমরা কেউ কারো সান্নিধ্য পাচ্ছি না। মনে হয় আমরা যেন কবে এক মহাদেশের, এক মাটির উপরেই ছিলাম; তার পরে না জানি কার অভিশাপে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। আমরা স্মৃতির সিঁড়ি বেয়ে একে অপরের কাছে যাবার জন্য ব্যাকুল, কিন্তু দেশ ও কালের ব্যবধান কিছুতেই দূর হতে চায় না। এক স্থূল বস্তুপিণ্ডের বর্তমান জগতে নির্বাসিত হয়েছি, কল্পনার অমরাবতী অলকাপুরীতে ফিরে যাবার পথ খুঁজে পাচ্ছি না। সেখানে যে বিরহিণী প্রিয়া নিত্যকাল ধরে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে একমাত্র মেঘই সেখানে আমাদের কল্পনাকে নিয়ে যেতে পারে। আমাদের ঈপ্সিত ব্যক্তি কালের সীমা লঙ্ঘন করে কোন্ দূর অতীত লোকে বাস করছে, তার সঙ্গে মিলনের উপায় কি? আসলে তাকে আর শরীরী সত্তায় পাওয়া যাবে না, শুধু আভাসে ইঙ্গিতে গন্ধে গানে মূর্চনায় তার আভাস ভেসে আসবে।

এরপর কবির ব্যক্তিগত শূন্যতা ও বিরহবেদনা বিশ্বমানবের মনে সঞ্চারিত হয়ে গেল। কখনো বা মনে হচ্ছে আমরা প্রত্যেকেই যেন বিরহী যক্ষ, নির্জন গিরিশৃঙ্গে দাঁড়িয়ে উত্তরমুখে চেয়ে সুদূর অলকাপুরীর মণিহর্ম্যে-শায়িত-ক্ষীণ-শশাঙ্কলেখার মতো বিরহিণী প্রিয়াকে স্মরণ করছি। এই স্মরণের পথে তাকে উপলব্ধি করা, আর বাসনার সোনা গলিয়ে তার মূর্তি গড়ে তোলা ছাড়া আমাদের কী-ই বা করবার আছে। মেঘদূতের যক্ষ শাপাবসানে তার প্রিয়ার সঙ্গে মিলিত হবে এই আশ্বাসে সে বুক বেঁধে আছে। কিন্তু আমরা? কোথায় আমাদের হারানো আধখানা। মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা ছন্দ ও নববর্ষার ঘনঘটা আমাদের হৃদয়ে সেই অনাস্বাদিত আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দেয়। যে ছিল স্মৃতিলোকে নির্বাসিত, তাকে কল্পনার জগতে জাগিয়ে তুলে আবার জাগরসত্তায় পেতে চাই। কিন্তু তার কোনো উপায় নেই। উভয়ের মধ্যে কালের দুস্তর ব্যবধান। তাই মেঘদূত শুধু বাসনাকে জাগিয়ে তোলে, হারানো ব্যথাকে আবার অনুভূতিলোকে তুলে ধরে। কিন্তু মানসসরোবরের অগমপারে যে নির্বাসিত, তাকে এই পরিচিত ধূলিম্লান পৃথিবীতে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এমন একটি বিষণ্ণতার ঝঙ্কার দিয়ে কবি মেঘদূত প্রবন্ধটি শেষ করেছেন।

পত্র : বি-কোর-৪১২

তুলনামূলক সাহিত্য

পর্যায় গ্রন্থ : ৩

একক-৩

মেঘদূত (সনেট) চৈতালি

বিন্যাসক্রম :

৪১২.৩.৩.১ : মেঘদূত (সনেট) চৈতালি

৪১২.৩.৩.১ : মেঘদূত (সনেট) চৈতালি

সৌন্দর্য ও প্রেমের যে সুনিবিড় উপলব্ধি আমরা রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' কাব্যে দেখতে পাই, তার পরিণতি দেখতে পাই চৈতালি' কাব্যে। জল-স্থল-অন্তরীক্ষ ব্যপ্ত করে যে সৌন্দর্যস্রোত প্রবাহিত, মানব-জীবনের শত শত বৈচিত্র্যময় প্রকাশে প্রেমের যে অমৃত-প্রস্রবণ ঝরে পড়ছে কবি তাকে গভীর ভাবে অনুধাবন করেছেন। এই বিশ্বসৌন্দর্য ও প্রেমকে তিনি জগতের মধ্যে থেকে জগতের অতীত করে, খণ্ডে ও অখণ্ডে, রূপে ও ভাবে উপলব্ধি করেছেন। তিনি বুঝেছেন এই পৃথিবীর ধূলিকণা পর্যন্তও অপূর্ব গৌরবে গৌরবান্বিত। কিছুই নিরর্থক নয়ব্যর্থ নয়। সবই সৌন্দর্যময়, অমৃতময়। জগতের কিছু তুচ্ছ নয়, ক্ষুদ্র নয়; ক্ষুদ্র, নগণ্য মানুষের সুখ-দুঃখও বৃহৎ তাৎপর্যে ও সার্থকতার মধ্যে বিরাজ করছে। রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনা ও উপলব্ধির সার্থক রূপায়ণ আমরা দেখতে পাব চৈতালি কাব্যের 'মেঘদূত' কবিতায়।

কবি মনে করেছেন, কবি কালিদাস (এক্ষেত্রে যক্ষ) তাঁর কল্পনার কুঞ্জবনেযৌবনের রাজসিংহাসনে প্রিয়ার সঙ্গে বসে আছেন; আর ছয় ঋতু ছয় সেবাদাসীর মতো, তাঁদের সামনে নৃত্য করছে এবং তাঁদের যৌবন-তৃষ্ণাকাতর মুখে নানাবর্ণময়ী মদিরা তুলে দিচ্ছে। এই সংসার যেন তাঁদের বাসর ঘর'নাই দুঃখ নাই দৈন্য নাই জনপ্রাণী/ তুমি শুধু আছ রাজা, আছে তব রাণী'। কিন্তু তারপর হঠাৎ দেবতার (যক্ষ প্রভু কুবের) অভিশাপে সে সুখরাজ্য ছারখার হয়ে গেল। প্রিয়ার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটল। ছয় ঋতু সভা ভঙ্গ করে চামরছত্র, পানপাত্র প্রভৃতি ফেলে দূরে পালিয়ে গেল। যৌবনের বসন্ত রঙিন পৃথিবীর পরিবর্তে আষাঢ়ের অশ্রুমুখী ধরণীর আবির্ভাব ঘটল। কালিদাসের সঙ্গে রবীন্দ্র ভাবনার একটি পার্থক্য এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবেকালিদাসের মেঘদূত কাব্যে কুবেরের অভিশাপ যক্ষকে বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের চৈতালি-র মেঘদূত কবিতায় অভিশাপ যক্ষের কাছে একটি

সুযোগ হিসাবে উপস্থিত হয়েছে। যে প্রিয়াকে নিয়ে যক্ষ চারপাশের সব ভুলে ছিল; প্রিয়া বিচ্ছিন্ন যক্ষের কাছে চারপাশের প্রকৃতি পরিবেশ, পর্বত-কানন, নগর-নগরীর মাঝে জীবনের গভীরতম বাণীকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করবার সুযোগ উপস্থিত হয়েছে—

সহসা খুলিয়া গেল, যেন চিত্রে লেখা,
আষাঢ়ের অশ্রুপ্লুত সুন্দর ভুবন।
দেখা দিল চারদিকে পর্বত কানন
নগর নগরী গ্রামবিশ্বসভামাঝে
তোমার বিরহবীণা সকরুণ বাজে।

আসলে কবি বুঝেছেন কুবেরের অভিশাপ মিলনের সুখরাজ্যে প্রবেশ করে যৌবনের মত্ততাকে বিচ্ছেদের অশ্রুবারিসেকে স্নিগ্ধ বেদনাময় করে তুলেছে। এই বিচ্ছেদ না ঘটলে যক্ষ কখনো প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারত না।

পত্র : বি-কোর-৪১২

তুলনামূলক সাহিত্য

পর্যায় গ্রন্থ : ৩

একক-৪

যক্ষ (কবিতা) সানাই

বিন্যাসক্রম :

৪১২.৩.৪.১ : যক্ষ (কবিতা) সানাই

৪১২.৩.৪.১ : যক্ষ (কবিতা) সানাই

যক্ষ কবিতায় প্রবল প্রাণাবেগে, যেন বাঁধনছাড়া বিচ্ছেদ দুঃখ মেঘরূপে রামগিরি থেকে অলকাপুরীর দিকে উড়ে চলেছে। বিচ্ছেদের অপূর্ণ বেদনা চলেছে পূর্ণের দিকে। অপরদিকে সেই বিরহিণীও স্থানু হয়ে নেই, সে যেন প্রিয় মিলনের জন্য দণদ-পল গুনে চলেছে।কবি দেখেছেন মেঘযাত্রার সঙ্গী হয়েছে যক্ষের বিরহবেদনা। বিরহের তীব্র বেদনার মধ্যে দিয়েই তো যক্ষ তার প্রিয়ার অনন্ত প্রেম লাভ করবে। যক্ষপ্রিয়াও অলকায় যেন কারাকক্ষে স্বেচ্ছাবন্দিত্ব যাপন করছে। সেও প্রিয়বিচ্ছেদের দ্বারা আহত হয়ে মিলনস্বর্গ লাভ করতে চায় মর্ত্যজীবনের বেদনামাধুরীর মধ্যে দিয়ে। নিবিড় ব্যথার সাথে পরমসুন্দরকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় যক্ষপ্রিয়া উদগ্রীব হয়ে আছে। তীব্র কষ্টের মধ্যে দিয়ে তারা পরস্পরের কাছে আরো সত্য হয়ে উঠেছে

তারই সাথে উড়ে চলে বিরহীর আগ্রহ-বারতা
চিরদূর স্বর্গপুরে,
ছায়াচ্ছন্ন বাদলের বক্ষোদীর্ণ নিশ্বাসের সুরে।
নিবিড় ব্যথার সাথে পদে পদে পরমসুন্দর
পথে পথে মেলে নিরন্তর।

কবি দেখিয়েছেনভোগের দ্বারা এই বিপুল পৃথিবী, এই চিরকালের পৃথিবী, আমাদের কাছে খর্ব হয়ে গেছে। আমরা তাকে যতটুকু পেয়েছি, তাকে ততটুকু বলে জানি। আমার ভোগের বাইরে তার অস্তিত্ব আমি গণ্যই করি না। কিন্তু যক্ষ কবিতাসূত্রে আমাদের উপলব্ধি ঘটে সে আমার নহে, আমার পৃথিবীটুকুর নহে; সে আমাকে কোন অলকাপুরীতে, কোন্ চিরযৌবনের রাজ্যে, চিরবিচ্ছেদের বেদনায়, চিরমিলনের আশ্বাসে, চিরসৌন্দর্যের কৈলাশপুরীর তীর্থাভিমুখে আকর্ষণ করতে থাকে। আমরা বুঝতে পারি প্রভুর অভিশাপেই এখানে আটকা পড়ে আছি। মেঘ এসে বাইরে যাত্রা করবার জন্য আহবান করে এবং তা-ই পূর্বমেঘের গান; আর যাত্রার অবসানে চিরমিলনের আশ্বাস দেয়ইহা উত্তরমেঘের সংবাদ। প্রথমে বন্ধন ছেদন করে বের করে, পরে একটি ভূমার সঙ্গে বেঁধে দেয়। সকালে পথে নিয়ে আসে, সন্ধ্যায় ঘরে ফিরিয়ে আনে। যক্ষ কবিতায় বিচ্ছেদ অনলে দগ্ধ যক্ষ ও যক্ষপ্রিয়া এই মরমী সত্য উপলব্ধি করেছে।

পত্র : বি-কোর-৪১২

তুলনামূলক সাহিত্য

পর্যায় গ্রন্থ : ৩

একক-৫

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের যক্ষের নিবেদন

বিন্যাসক্রম :

৪১২.৩.৫.১ : সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের যক্ষের নিবেদন

৪১২.৩.৫.১ : সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের যক্ষের নিবেদন

কবি কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের অনুসরণে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রচনা করেছেন যক্ষের নিবেদন কবিতাটি। আটটি স্তবকে সজ্জিত কবিতাটিতে কবি সত্যেন্দ্রনাথ অচেতন মেঘের উপর মানুষের ব্যবহার আরোপ করেছেন। কবিতায় বিরহী যক্ষের সাথে সাথে কবি মনও যেন কলকোলাহল মুখরিত পৃথিবীর বন্ধনমুক্ত হয়ে এক গভীর স্বপ্নে মুগ্ধ হতে চেয়েছে শৈলের পইঠায় দাঁড়ায়ে আজি হায় প্রাণ উধাও ধায় প্রিয়ার পাশ/ মূর্চার মন্তর ভরিছে চরাচর, ছায় নিখিল কার আকুল শ্বাস!' উধাও যাত্রা কবির। কবিতার শুরুতেই রয়েছে সূর্যের রক্তিম নয়নের বহ্নির কথা। পিপাসায় আকুল ধরণীকে তৃপ্ত করার জন্য চাই মেঘের স্নেহধারা। দ্বিতীয় স্তবকে যক্ষের দুঃখের বর্ণনা শুরু। তৃতীয় স্তবকে বিরহী যক্ষের মধ্যে দুঃখী মানুষের রূপচিত্র অঙ্কন করা হয়েছে

ভরপুর অশ্রুর বেদনা ভারাতুর মৌন কোন্ সুর বাজায় মন,
বক্ষের পঞ্জর কাঁপিছে কলেবর, চক্ষে দুঃখের নীলাঞ্জন!

মেঘের বন্দনা করেছেন কবিকারণ বন্দনাই কাউকে খুশি করতে পারে। কবি মেঘকে বলেছেন ' পুষ্কর বংশের চূড়া যে তুমি মেঘ'। প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে কালিদাসের কাব্যের সঙ্গে এখানে মৌলিক পার্থক্য আছে — সত্যেন্দ্রনাথ যক্ষের অভিশাপকে কেন্দ্র করে একটি যৌক্তিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। একজনের অপরাধে দুজনের শাস্তি পাওয়াটা কোনো ভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। প্রভু কুবেরকে অভিযুক্ত করে কবি জানিয়েছেন তার রাজ্যে সঠিক বিচার নেই

নিষ্ঠুর যক্ষেশ, নাহিক কৃপালেশ, রাজ্যে আর তার বিচার নেই,
আজ্ঞার লঙ্ঘন করিল একে, আর শাস্তি ভুঞ্জান দুজনকেই!

হায় মোর কান্তার না ছিল অপরাধ, মিথ্যা সয় সেই কতই ক্লেশ
দুর্ভর বিচ্ছেদ অবলা বুকে বয়, পাংশু কুন্তল, মলিন বেশ।

এই যুক্তির কথা শুনিয়ে যক্ষ মেঘকে দ্রুত প্রিয়ার কাছে যেতে অনুরোধ করেছে। কেননা সে বিরহিণী কোনোরকমে জীবন ধারণ করে আছে। যে কোনো মুহূর্তে জীবনবৃন্ত থেকে খসে পড়তে পারে। প্রিয়ার জন্য শত চিন্তায় প্রবাসে যক্ষের সুখ নেই। মেঘ দ্রুত অলকাপুরীতে গিয়ে যক্ষের সংবাদ প্রদান করে যক্ষপ্রিয়ার প্রাণ বাচাক। মেঘের জন্য যক্ষের আশীর্বচনতার জীবনে (মেঘের) কখনো যেন বিদ্যুৎ বিচ্ছেদ না ঘটে।

সহায়ক গ্রন্থ

১। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা।

২। কল্যাণীশঙ্কর ঘটক। মেঘদূত-জিজ্ঞাসা। রত্নাবলী, কলকাতা।

৩। নরেন্দ্র দেব (সম্পা.)। কালিদাসের মেঘদূত। দে'জ, কলকাতা।

৩। বুদ্ধদেব বসু (সম্পা.)। কালিদাসের মেঘদূত। এম. সি. সরকার অ্যণ্ড সন্স প্রাইভেট লি., কলকাতা।

৪। রাজশেখর বসু (সম্পা.)। কালিদাসের মেঘদূত। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা।

সম্ভাব্য প্রশ্ন

১। রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্যের মেঘদূত প্রবন্ধ অনুসরণে যক্ষ ও যক্ষপ্রিয়ার যে বিপুল বিচ্ছেদ বেদনার কথা আমরা একালে উপলব্ধি করি তা আলোচনা করো।

২। মেঘদূত বাসনাকে শুধু জাগিয়ে তোলে, হারানো ব্যথাকে আবার অনুভূতিলোকে তুলে ধরে — প্রাচীন সাহিত্যের মেঘদূত প্রবন্ধ অনুসরণে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো।

৩। চৈতালী-র মেঘদূত কবিতায় কুবেরের অভিশাপসূত্রে যক্ষের সামনে জগৎ-জীবনকে উপলব্ধি করার যে একটি সুযোগ তৈরি হল তা ব্যাখ্যা করো।

৪। যক্ষ ও যক্ষপ্রিয়ার বিচ্ছেদ-বেদনাসূত্রে যক্ষের নিবেদন কবিতায় কবি যে যৌক্তিক প্রশ্নের অবতারণা করেছেন তা কবিতাটি অনুসরণে আলোচনা করো।

পত্র : বি-কোর-৪১২

তুলনামূলক নাটকের আলোচনা

পর্যায় গ্রন্থ ৪

একক-১

তুলনামূলক সাহিত্য

Comparative literature

তুলনামূলক সাহিত্য বলতে আমরা বুঝি বিভিন্ন সাহিত্যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের মধ্যে তুলনা। তুলনামূলক সাহিত্যে বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের প্রকাশভঙ্গি, বিষয়বস্তু, অনুভূতির তুলনামূলক আলোচনা করতে পারি। তুলনামূলক সাহিত্য হল ডিসিপ্লিন, যে ডিসিপ্লিনের মধ্যে দিয়ে আমরা যে কোন টেক্সটকে বিচার, পর্যালোচনা করতে পারি। তুলনামূলক সাহিত্যের সুবর্ণ জয়ন্তী লগ্নে সর্বাগ্রে যিনি প্রণামের যোগ্য, তিনি মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। এখানে আমরা সাহিত্যের কিছু দিক খুঁজে পাই যা নিচে সারিবদ্ধভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে-

১. সাহিত্য এক ধরনের বাচিক সংজ্ঞাপন (ভার্বাল কমিউনিকেশন)

২. Toolorov এবং Duecot একে অভিহিত করেছেন ডেলিভারেশন বলে।

৩. বাচিক সংজ্ঞাপনের তত্ত্ব অনুযায়ী যখন কোন বার্তা নিজের উপর কেন্দ্রীভূত হয় তখন কাব্যিক বৃত্তি (পয়েটিক ফাংশন) প্রকাশ পায়। সৃজনশীল সাহিত্য এই কাব্যিক বৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

৪. সৃজনশীল সাহিত্যে অর্থের অভিধাবৃত্তি ছাড়াও লক্ষ্যণা বৃত্তি প্রকাশ পায়।

৫. প্রতিটা সাহিত্যের সঙ্গে ভাষা এবং সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ, ভৌগোলিক অবস্থান, আবহাওয়া এবং ঐতিহাসিকের সঙ্গে যুক্ত।

৬. সাহিত্য কোন সময়ই যা ঘটেছে বা যা ঘটছে তা নয়। বরঞ্চ লেখক, কবি এমন কিছু উপস্থাপিত করেন যা হওয়া সম্ভব অর্থাৎ বাস্তব নয়, ঘটনা নয়, কিন্তু বাস্তবিক (Not the real but verisimilitude)।

৭. অর্থাৎ কোন সাহিত্য একটি অঞ্চলের ভাষা, ভূগোল, ইতিহাস, জলবায়ু, ভাষা এবং সংস্কৃতির সম্মিলিত (প্রোডাক্ট) যাতে ধর্মবিশ্বাসেরও প্রবল ভূমিকা আছে।

৮. বিভিন্ন ভাষা বা অঞ্চলের সাহিত্যের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই কিছু পার্থক্য দেখা যায়।

৯. কিন্তু মানুষের বিভিন্ন মানসিক বৃত্তি এবং অনুভূতি জীবন-যাত্রার দুঃখ-কষ্ট, আনন্দ-বেদনার মধ্যে সর্বত্রই একই ধরনের বস্তু লক্ষ্য করা হয়।

১০. ভাষার সংস্থাপন পার্থক্য (স্ট্রাকচারাল ডিফারেন্স) সাহিত্যের একটি বড় জায়গা, যা সাহিত্যের লক্ষণ এবং ব্যঞ্জনাকে দ্যোতিত করে। হিন্দির একটি উক্তি করা যাক

"যব ওহ তিন বের খাতী থী,

অব ওহ তিন বের খাতী হে।।"

এই ভাব বা কবির অনুভূতিকে আমরা অন্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারি, কিন্তু কাব্যিকতাকে আমরা পারবো না, যেটা হিন্দি ভাষার শব্দ সংস্কার, ধ্বনি সংস্থান ও কাব্যিকতা উঠে এসেছে।

১১. আমরা বিভিন্ন সাহিত্যের তুলনা করলে পার্থক্যের সাথে সাথে (Hitery univarsals) বিশ্বজনীন সাহিত্যের উপাদানগুলো (Hitery universals) আর বিভিন্ন সাহিত্যের প্রকাশভঙ্গীর (literary forms) সাথে পরিচিত হই। এটি আমাদের সমৃদ্ধতর করে তোলে।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে ইংরেজি ভাষায় কম্পারেটিভ লিটারেচার শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন ম্যাথু আর্নল্ড। 'কম্পারেটিভ লিটারেচার ইন ইন্ডিয়া এ হিস্টোরিকাল পারস্পেক্টিভ' শীর্ষক প্রবন্ধে ড. শিশির কুমার দাস উল্লেখ করেছেন, শুধুমাত্র ভাষাগত পরিচয় দিয়ে কোন সাহিত্যের আত্মাকে প্রতিষ্ঠা করা যায়, অত্যন্ত বহুভাষিক ক্ষেত্রে সম্ভব নয়।

ভারতীয় সাহিত্যের পটভূমি, প্রেক্ষাপট, পাশ্চাত্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন? দুটো বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষভয়াবহতা ভারতীয়দের অভিজ্ঞতার বাইরে। ভারতবর্ষীয় সমাজ, সামাজিক সংস্কার, আদব-কায়দা সবই মেরুপ্রমাণ দূরত্বে। পাশ্চাত্যের প্রভাব এদেশীয় সাহিত্যে কিভাবে পড়েছে সেটা তুলনামূলক সাহিত্যের বিষয়, সেটি হলো দেশীয় আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্যগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক। সৃজনশীল লেখকের কাছে তিনটি জিনিস কাজ করে আবহাওয়া, ভৌগোলিক সংস্থান ও ধর্মসংস্কৃতি।

তুলনামূলক সাহিত্যকে জানতে হলে ছয়টি সংজ্ঞাকে জানতে হবে-

১. ভাষার ইতিহাস।

২. সাহিত্যের ইতিহাস।

৩. ভাষার সংস্থান— ক. আপাত সংস্থান, খ. নিহিত সংস্থান।

৪. রচনা কাল।

৫. লেখকের পৃষ্ঠপাট— স্থান, দর্শন, মানসিকতা, শিক্ষা।

৬. উদ্দেশ্য পাঠক ও লেখকের উদ্দেশ্য।

এই বৈশিষ্ট্যর আলোকে সৃষ্টি হয় তুলনামূলক সাহিত্য

তুলনামূলক সাহিত্যে মেথডলজির মূল সাতটি তাত্ত্বিক ধারা—

১) প্রসঙ্গতত্ত্ব বা Themotology

২) বর্ণতত্ত্ব বা Gemology

৩) ইতিহাস বিদ্যা বা Historigraphy

৪) সাহিত্যিক প্রভাব বা Infulence

৫) প্রতিগ্রহণ বা Reception

৬) সাহিত্যিক ইতিহাস বা Literary Theory

৭) অনুবাদ তত্ত্ব বা Translation Theory

এই পদ্ধতিগুলির সাহায্যে একাধিক দেশ বা ভাষার সাহিত্যকে তুলনামূলক আলোচনায় এক সৃষ্টিশীল গবেষণাগত পদ্ধতি হল তুলনামূলক সাহিত্য।

১) প্রসঙ্গতত্ত্ব বলতে বোঝায়, যখন কোন প্রসঙ্গকে ভিত্তি করে তুলনা করা হয়। যেমন— হোমারের এপিক, ইলিয়ডের বিষয়, 'যুদ্ধ' আবার তলস্তয়ের নোবেল, 'ওয়ার এন্ড পিস' -এর বিষয় ও যুদ্ধ। এখানে প্রসঙ্গের সূত্র ধরে একটি তুলনামূলকতার ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে।

২) বর্ণের সূত্র ধরে যখন তুলনা করা হয় তখন তাকে বলা হয় বর্ণতত্ত্ব। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'পথের পাঁচালী' বাংলা উপন্যাসের বাস্তববাদের সূচনা করেছে অর্থাৎ বর্ণের ক্ষেত্রে একটা মাত্রা সংযোজন করেছে। এটি বর্ণতত্ত্বের বিষয়।

৩) কাম্যু দেখেছেন উপনিবেশের দৃষ্টিকোণ থেকে। এটা গোটা ব্যাপারটাই ইতিহাস বিদ্যার বিষয়। ইতিহাস বিদ্যা আমাদের ঐতিহাসিক অবস্থানটি সম্পর্কে সচেতন করে দেয়, 'আত্ম' ও অপরের বিভাজনটিকে স্পষ্ট করে তুলে ধরে, যাতে আমাদের ইতিহাস চেতনায় কোন আত্মপ্রতারণার সুযোগ তৈরি না হয়।

৪) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ভারতীয় সাহিত্য পাঠের ক্ষেত্রে তুলনামূলক নিয়মতত্ত্বই একমাত্র ও অনিবার্য মাধ্যম হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। পাশাপাশি ঔপনিবেশিকতার ফলে পশ্চিমের সাহিত্যের অভিঘাতও ভারতীয় সাহিত্যে এসে পড়েছে।

৫) সাহিত্যের প্রতি গ্রহণকে না বুঝে সাহিত্য পাঠ সম্ভব নয়। মধুসূদনের পর রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আবার ফিরে পান ভারতীয় আঙ্গিক।

পর্যায় গ্রন্থ ৪

একক - ২

তুলনামূলক সাহিত্যের সংজ্ঞা, স্বরূপ ও বিশ্লেষণ

নানা দেশের নানা ভাষার সাহিত্যে মিল ও সম্পর্কের পরীক্ষা এবং বিশ্লেষণ তুলনামূলক সাহিত্যের বিষয়। মূলত উনিশ শতক থেকেই তুলনামূলক সাহিত্যে আলোচনা শুরু হয়। সাহিত্য রচনা প্রভাব ও অনুকরণের প্রসঙ্গ যুগ ও পর্যায় ভাগ প্রকরণ ও আন্দোলনের পরিচয় থিম ও মোটিভের আলোচনা, সাহিত্য ও অন্যান্য শিল্পের সম্পর্ক — এইসব কি কিছুই তুলনামূলক সাহিত্যের বিষয় হতে পারে। যারা তুলনামূলক সাহিত্যের আলোচনা করে, তাদের Comparatists বলা হয়। তুলনামূলক সাহিত্য ও তুলনামূলক তথ্যের আলোচনা প্রায় একই সময় থেকেই শুরু হয়। তুলনামূলক ভাষাবিদ্যা এবং তুলনা নির্ভর সমালোচনার মতো তুলনামূলক সাহিত্য আলোচনা নির্ভর।

সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্যের ইতিহাস এবং সাহিত্যের সমালোচনা এই তিন দিক থেকে একভাবে সাহিত্য বীক্ষা সম্ভব। অন্য দিক থেকে তুলনামূলক সাহিত্য, সাধারণ সাহিত্য এবং জাতীয় সাহিত্য এই তিনটি বিধিবদ্ধ বিভাজনের ওপর নির্ভর করেও সাহিত্যিক বীক্ষা সম্ভব। কিন্তু তুলনামূলক সাহিত্যে তুলনামূলকতার অংশটিকে সংজ্ঞার্থে নির্ধারিত করা সহজ নয়। ১৮৪৮ এ ম্যাথু আর্নল্ড (Mathew Arnold) প্রথমে ইংরেজিতে "Comparative Literature" বাক্যাংশটি ব্যবহার করেন। তারা উনিশ শতকের সূচনায় ব্যবহৃত তুলনামূলক শরীর সংস্থান বিদ্যার ধারণা থেকে এই শব্দটি ব্যবহারের ইশারা পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথম বাংলায় তুলনামূলক সাহিত্য শব্দটির প্রয়োগ ঘটান। কিন্তু এক্ষেত্রে তুলনামূলক শব্দটি কোন বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত তা বোঝা যায় না। কারণ সব ধরনের বিষয়ে তুলনামূলকতার সুযোগ রয়েছে। তা কোনো মতেই বিশেষভাবে সাহিত্যের সামগ্রী নয়।

তুলনামূলক সাহিত্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু সমীক্ষার ক্ষেত্র এবং কিছু সমস্যাও রয়েছে। প্রথমত, মৌখিক সাহিত্য বা লোকসাহিত্যের সঙ্গে তুলনামূলক সাহিত্যের যোগ লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন লোককথা এবং তাদের চরিত্র আলোচ্য বিষয়। একদিকে লোকসাহিত্য লোকসংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কান্বিত। কিন্তু অন্যদিকে শাশ্বত বিদ্যাবার্তাও লোকসাহিত্যে আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করে। তার কারণ, লোকসাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের যোগ এ দুই-এর প্রভাব এই আলোকে অস্বীকার করা যায় না। অনেক সাহিত্য প্রকরণ সমাজ ও লোকায়ত রচনা থেকে উদ্ভূত। অবশ্যই জনপ্রিয় সেসব গাথা, গীতিকা, রূপকথার সঙ্গে আমরা পরিচিত। তা অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে এবং উচ্চবর্গের মানুষদের কাছ থেকেই পাওয়া গেছে। এজন্য সাহিত্য আলোচককে সাহিত্য বিকাশের বিচারে মৌখিক সাহিত্য ও লোকসাহিত্য সম্পর্কেও অবহিত হতে হয়। মৌখিক সাহিত্যের আলোচনা পূর্বে নানা দেশে কিরকম রূপ পরিগ্রহ করেছিল, তা আলোচনাতেই বর্ণিত ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে লোকসাহিত্যের রূপগত বিন্যাস সম্পর্কে এবং রচয়িতা, উপভোক্তার সম্পর্ক সম্পর্কেও সচেতন। মৌখিক সাহিত্যের সমস্যায় লিখিত সাহিত্য সমস্যার সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই এক এবং মৌখিক ও লিখিত সাহিত্যের মধ্যে ধারাবাহিকতা কখনোই ক্ষুন্ন হয়নি। প্রাচ্যে ব্ল্যাভ

ও স্ক্যান্ডিনোভিয়া দেশগুলিতে এই ধারাবাহিকতা সম্পর্কে সচেতন ছিল এবং পাশ্চাত্যের দেশগুলির তুলনায় এই দেশগুলিতে অনেক বেশি সচেতনতা ছিল। কিন্তু লোকসাহিত্যকে তুলনামূলক সাহিত্য বলে চিহ্নিত করা যায় না।

তুলনামূলক সাহিত্য প্রধানত দুই বা ততোধিক সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। ফরাসি দেশ থেকে এই জাতীয় তুলনামূলক রীতির সূচনা হয়েছে। ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে গ্যাটের প্রভাব, ফ্রান্সে কার্লাইল ও শীলারের এর প্রভাব এই জাতীয় তুলনামূলক সাহিত্য বিচারের বিষয় হয়েছে। এই জাতীয় প্রভাব বা অভিঘাতে আলোচনার মধ্য দিয়ে একটি পদ্ধতি বিকশিত হয়েছে। এই জাতীয় আলোচনায় সমালোচনা অনুবাদ, অনুবাদে বা ভ্রমণকারী এবং বিদেশি লেখক গ্রহণের অনুকূল পরিবেশ এগুলির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পশ্চিম ইউরোপের সাহিত্যের যোগসূত্র সংক্রান্ত অনেক তথ্যই এভাবে সঞ্চিত হয়েছে। বৈদেশিক বাণিজ্যের মতো এভাবেই আমাদের বৈদেশিক সাহিত্যের জ্ঞানও বৃদ্ধি পেয়েছে।

কিন্তু এইসব সঞ্চিত তথ্য নির্ভর করেও কোন নির্দিষ্ট বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে তুলনামূলক সাহিত্য উপনীত হতে পারেনি। ফ্রান্সের শেক্সপীয়ার আঠারো শতকের ইংল্যান্ডের শেক্সপীয়ার এ দুটি আলোচনায় রূপগত বিশ্লেষণে কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। এই জাতীয় আলোচনা একেকটি সাহিত্যকর্ম বিশ্লেষিত হতে পারে না। বিচারের বিষয় হতে পারে না, রচয়িতা সৃষ্টি প্রণালীর জটিল প্রক্রিয়াটিরও আলোচনা হয় না। ফলে এ জাতীয় আলোচনা অনেক সময় দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুবাদের দ্বারা প্রথম শ্রেণীর রচনার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। কোন শ্রেষ্ঠ রচনায় প্রাক-ইতিহাস তাও তুলনামূলক আলোচনার বিষয় হতে পারে। তুলনামূলক সাহিত্যের ঝোঁক বহিরঙ্গে তুলনার দিকেই বেশি ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে একটি মোড় বদল লক্ষ্য করা যায়। উৎস এবং অভিঘাতের আলোচনাতেই তুলনামূলক সাহিত্য অনেক বেশি ব্যাপৃত।

অন্যভাবেও তুলনামূলক সাহিত্যের আলোচনা হতে পারে। এই বিবেচনা সাহিত্যকে সমগ্র বিশ্বসাহিত্যের আলোচনার সঙ্গে বা বিশ্বজনীন সাহিত্যের আলোচনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়। গ্যাটে (World literature) পদবন্ধটির ইংরেজি করা হয়েছে world literature, রবীন্দ্রনাথ এর বাংলা করেছিলেন বিশ্বসাহিত্য, এই অভিধা থেকে মনে হতে পারে বিশ্বের সব মহাদেশের সমস্ত সাহিত্যই বিশ্বসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু গ্যাটে এরকম কোন অর্থেই বিশ্বসাহিত্য শব্দটি ব্যবহার করেননি। গ্যাটে বোঝাতে চেয়েছিলেন এমন এক সময় আসবে যখন বিশ্বের সব সাহিত্য এক হয়ে যাবে। এক বিরাট সংশ্লেষে সব সাহিত্যের যেন ঐক্যসম্ভব হয়। বিশ্বের ঐক্যতানে সব জাতি যেমন তার নিজস্বতার সুর যোজনা করবে। কিন্তু গ্যাটে নিজে জানতেন এটি একটি বহু দূরবর্তী আদর্শ। কারণ কোন জাতি তার নিজস্বতা ছেড়ে দিয়ে বিশ্ব সাহিত্যের ধারণায় বিলীন হতে পারে। বর্তমানে আমরা এই ধরনের সমগ্রতায় আরোও বিশ্বাস হারিয়েছি। তার কারণ আমরা ক্রমশই জাতীয় সাহিত্য সমূহে বৈচিত্র্য ও বিপুলতায় আরো আস্থাবান হয়ে উঠছি। অবশ্য ওয়ার্ল প্রযুক্ত হতে পারে। এর অর্থ হোমার, দান্তে, সার্ভেন্টিস, শেক্সপিয়ার, গ্যাটে, কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ শ্রেষ্ঠ ও সমসাময়িক উত্তীর্ণ রচয়িতাদের শ্রেষ্ঠ রচনাবলীকে বিশ্বসাহিত্য নামে অভিহিত করা যায়। এই বিচারে সবশ্রেষ্ঠ সাহিত্যই বিশ্বসাহিত্যের অন্তর্গত।

সাধারণ সাহিত্য থেকে তুলনামূলক সাহিত্যের পার্থক্য আছে কিনা সেটিও আলোচকদের ভাবিয়েছে। বলা হয়েছে সাধারণ সাহিত্যতত্ত্ব হচ্ছে সেই ধরনের সাহিত্য আন্দোলন, সাহিত্যরীতি যা জাতীয় সীমা লংঘন করেছে। অন্যদিকে তুলনামূলক সাহিত্য দুই বা ততোধিক সাহিত্যের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ে ব্যস্ত। কিন্তু এর পার্থক্য

নির্ধারণ বড়ই কঠিন। হল্যান্ডের বাইরে ওয়াল্টার স্কটের প্রভাব এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিকাশ-এ দুটি আলোচনার ক্ষেত্রে সীমারেখা করা শক্ত। কারণ তুলনামূলক সাহিত্য অনেক সময় সাধারণ সাহিত্য আলোচনাতে হারিয়ে যায়।

তবুও তুলনামূলক সাহিত্য জরুরী। কেননা সাহিত্যকে সমগ্র করে ভাববার প্রয়োজন রয়েছে। ভাষা-গত দিক বাদ দিয়েও সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশের আলোচনা জরুরী। আত্মকেন্দ্রিক কোন জাতীয় সাহিত্যের কথা ভাবা যায় না। পাশ্চাত্য সাহিত্য একপ্রকারের ঐক্য ও সমগ্রতা অর্জন করেছে। গ্রীস ও রোমের প্রাচীন সাহিত্যের সময় থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকার সাহিত্য একপ্রকার ঐক্য আছে। উনিশ শতকের সূচনায় শ্লেগেল ভ্রাতৃদ্বয় সিসমন্ড হেলান প্রমুখ। আলোচকরা এই ঐক্য সূত্রের আলোচনা করে গেছেন। কিন্তু জাতীয়তাবোধের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কীর্ণতার চর্চাও হয়েছে। বিবর্তনের প্রভাবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিশ্বজনীন সাহিত্যের ইতিহাসে একটি আদর্শ রচিত হয়। লোকসাহিত্যিক তাত্ত্বিকেরা, নৃবিজ্ঞানীরা-হার্বার্ট স্পেন্সারের প্রভাবে সাহিত্যের উৎস, লোকসাহিত্যের নানারূপের বৈচিত্র্য এপিক ড্রামা ও নানা রূপের উদ্ভব ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু জৈব বিবর্তনের তত্ত্ব শেষ পর্যন্ত সাহিত্য তত্ত্বের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারেনি। ফলে সাধারণ সাহিত্যের ইতিহাসে ঐতিহাসিক তত্ত্ব নির্ধারণের প্রবণতা তুলনামূলক সাহিত্যে ক্রমশই বেশি করে অনুভূত হতে থাকে। এরিখ আউরবাখ রচিত ১৯৪৬ এ প্রকাশিত "মাইমেসিস" (Mimesis) গ্রন্থটি এর চমৎকার উদাহরণ। প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদের প্রসঙ্গটি বাদ দিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতায় ধ্রুপদী ঐতিহ্য ধারাবাহিকতার সূত্রটিকে এখানে যথেষ্ট বিদ্যাচর্চার সঙ্গে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সংশ্লেষধর্মী সাহিত্যের ইতিহাস অধিক জাতীয়তাবাদী সাহিত্যের ইতিহাস লিখনের প্রয়োজন থেকে গেছে। তুলনামূলক সাহিত্যের আলোচনা পন্ডিতদের নানা ভাষায় পারঙ্গমতার দাবী করে। তার সঙ্গে সঙ্গে পটভূমি বিস্তারের প্রয়োজন। স্থানীয় ও আঞ্চলিক ভাবাকুলতার অবদমন প্রয়োজন। কিন্তু তা অর্জন করা কঠিন। শিল্প ও মানবতা একই। নানান দেশের নানান ভাষাবর্গ সম্পর্কে এজন্য প্রাথমিকভাবে সচেতন হওয়ার পথে অগ্রসর হয়েছে। ইতিহাস- আন্তর্জাতিক সাহিত্য রচনার একটি প্রকাশ বিষয় হতে পারে। ছন্দের আলোচনাও সীমাবদ্ধ গন্ডিপার হয়ে আন্তর্জাতিকতা লাভ করতে পারে। রেনেসাঁস আন্তর্জাতিকতাবাদ-প্রভৃতি আন্দোলন জাতীয় সীমান্ত লঙ্ঘন করে। অবশ্য এক্ষেত্রে এক দেশের সৈনিক ও অন্য দেশের সৈনিকদের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য থাকতে পারে। উনিশ শতকে ভাষাগত ব্যবধানের পর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভাষা শিক্ষা ও সাহিত্য শিক্ষা পৃথক হলে দুয়ের মধ্যে দূরত্ব রচিত হয়। অধিকাংশ মানুষ একটি ভাষার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখে। কিন্তু শুধু সেই ভাষায় রচিত সাহিত্যের বিচার করতে গিয়ে যে স্বভাবতই নানান ভ্রম তৈরী হয়। কোনো একটি বিশেষ ভাষার প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব দিলে, অন্যান্য ভাষা ও সেইসব ভাষার দায়িত্ব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মধ্যযুগের ইউরোপে ল্যাটিন চর্চার গুরুত্ব এই অর্থে হানিকর হয়েছিল।

তুলনামূলক সাহিত্য পঠন-পাঠনের অর্থ এই নয় যে প্রতিটি জাতীয় সাহিত্য সম্পর্কে অনাদরের ভাব-পোষণ করে। জাতীয়তার সমস্যা নির্বিশেষ সারস্বত প্রক্রিয়ায় এক-একটি জাতির নিদিষ্ট জ্ঞানের সমস্যা তুলনামূলক সাহিত্যের প্রধান স্থান দাবি করে। তাত্ত্বিক স্পষ্টতার সঙ্গে এই ধরনের সমীক্ষামুলক রচনা সম্ভব হয় না। তার কারণ জাতীয়বোধ জাতিতত্ত্ব আমাদের সমস্যার সীমারেখাটিকে অস্পষ্ট করে রেখে দেয়। নির্বিশেষ সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে বাংলা সাহিত্যের বিশেষ দান নির্ণয় করতে গেলে মূল্যবোধের পরিবর্তন হতে পারে এবং তার ফলে বাংলার প্রধান

সাহিত্যিকদের ভূমিকার ও বদল হতে পারে। প্রত্যেক জাতীয় সাহিত্যে অঞ্চল মহানগর কি ভূমিকা নেবে সেটা প্রধান সমস্যার বিষয় হতে পারে। তথ্য নির্ভর এবং সংক্ষুব্ধ বিচার পদ্ধতি নির্ভর এই জাতীয় সমস্যার বিবেচনা প্রায়ই হয় না। বাংলাদেশ বা নিউ ইংল্যান্ডের আঞ্চলিক ভূমিকা নিয়ে যখন আলোচনা হয়। তাতে বিদগ্ধ আশাবাদ থাকে স্থানিকতার অহংকার থাকে এবং কেন্দ্রিকরনের জন্য ক্ষোভ থাকে। নিরাসক্ত বিশ্লেষণ করতে গেলে কোন লেখক কোন বংশধারায় উদ্ভূত হয়েছে, সেটি বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় না। বরং তাদের রচনায় তার অবস্থানের আঞ্চলিক প্রভাবকে এবং কোনো সাহিত্যিক ঐতিহ্যের প্রভাবকে মান্য করেছেন এই সমাজতাত্ত্বিক প্রশ্নটি বড় হয়ে ওঠে।

সাহিত্য জাতীয়তার সমস্যা আরও বিশেষ ভাবে জটিল হয়ে ওঠে যদি একই ভাষা থেকে একাধিক জাতীয় সাহিত্যের উদ্ভব হয়। যেমন বাংলা ভাষা থেকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সাহিত্য এবং বাংলাদেশী সাহিত্য এই দুটি পৃথক ধারার সৃষ্টি হয়েছে। আইরিশ ভাষাকে এক সময় ইংরেজী ভাষার সঙ্গে মিলিয়ে দেখাও হলেও আইরিশ ভাষার স্বাতন্ত্র্য করা যায়। এইজন্য ইতিহাস এবং জয়েস আইরিশ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু গোল্ড স্মিথকে আইরিশ সাহিত্যিক বলে ভাবা হয় না। ভারতে উনিশ শতক থেকেই ইংরেজী ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু কোনো সময়ের ইংরাজী সাহিত্যকে আমরা উপনিবেশ এর ইংরেজী না বলে স্বতন্ত্র স্বাধীন সারস্বত ভাষার ইংরেজী বলব। তা স্থিরও করা কঠিন সমস্যাটি কি শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতার ওপর নির্ভরশীল। কিংবা এটি লেখকদের জাতীয়তাবাদী চেতনার দ্বারা চিহ্নিত? এটি কি জাতীয় বিষয়বস্তু নির্বাচনের ওপর নির্ভর করে? এটি কি স্থানীয় বর্ণনা নির্ভর? এটি কি একটি নির্ধারিত জাতীয় সাহিত্য শৈলীর ওপর নির্ভরশীল। এসব প্রশ্নের উপস্থিত কোনো উত্তর দেওয়া যায় না।

এইসব সমস্যার সমাধান যখন করা সম্ভব হবে। তখন সত্যকারের জাতীয় সাহিত্য রচনার সম্ভব হবে কি না? সেখানে ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ থাকবে না। ভাষার সীমানায় আবদ্ধ থাকবে না। এভাবেই বিশ্লেষণ করলে জাতীয় সাহিত্যগুলি কিভাবে সাহিত্যধারার মধ্যে প্রবেশ করেছে তা লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বসাহিত্য এবং জাতীয় সাহিত্য পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। প্রত্যেক দেশেই প্রথার পরিবর্তন ঘটে। লেখকেরা একটি জাতীয় ঐতিহ্য থেকে অপর একটি জাতীয় ঐতিহ্যকে পৃথক করে। এক্ষেত্রে একই সাহিত্য এবং অপর সাহিত্যের, অংশীদারিত্বের পরিমান সঠিক ঠিক জানাল সমস্ত সারস্বত ইতিহাস জানা সম্ভব।

পর্যায় গ্রন্থ ৪

একক-৩

তুলনামূলক সাহিত্য : পরিবর্তিত লক্ষ্যে, নতুন পথে

যোহান উল্ফগং গ্যেটে যেটিকে 'ওয়ার্ল লিটারেচার' (World literature) অভিধা দিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে সেটি হয়ে উঠেছে তুলনামূলক সাহিত্যের উৎস-সূত্র। ইউরোপে উনিশ শতকের সূচনা লগ্নেই এর চর্চা শুরু হয়েছিল। কিন্তু আগে-পরে এশিয়াতেও এর চর্চা ছিল। ভারত, চিন, জাপান, কোরিয়া এবং আরব দেশগুলোর সাহিত্য সম্পর্কে পাশ্চাত্যের তাত্ত্বিকদের একটি পর্যায় পর্যন্ত তেমন একটা সচেতন না থাকলেও এশিয়ার দেশগুলো, যার বড় একটি অংশ ঔপনিবেশিক শাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেসব অঞ্চলের সাহিত্য সম্পর্কে ক্রমে তাঁদের আগ্রহ তৈরি হয়েছে।

গ্যেটে যেটিকে 'ওয়ার্ল লিটারেচার' বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেটিকে আর ও স্পষ্ট করে বুঝে নিতে চাইলেন। তিনি 'বিশ্বসাহিত্য' প্রবন্ধে সেটি তুলে ধরেছেন। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী ইংরেজিতে যাকে Comparative Literature বলা হয়, বাংলার তাকেই তিনি বিশ্বসাহিত্য মনে করেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

> "... সাহিত্যকে দেশ কাল পাত্রে ছোটো করিয়া দেখিলে ঠিকমতো দেখাই হয় না। আমরা যদি এইটে বুঝি যে, সাহিত্যে বিশ্বমানবই আপনাকে প্রকাশ করিতেছে তবে সাহিত্যের মধ্যে আমাদের যাহা দেখিবার তাহা দেখিতে পাইব। যেখানে সাহিত্যরচনায় লেখক উপলক্ষ মাত্র না হইয়াছে সেখানে তাহার লেখা নষ্ট হইয়া গেছে। যেখানে লেখক নিজের ভাবনায় সমগ্র মানুষের ভাব অনুভব করিয়াছে, নিজের লেখায় সমগ্র মানুষের বেদনা প্রকাশ করিয়াছে, সেইখানেই তাহার লেখা সাহিত্যে জায়গা পাইয়াছে। তবেই সাহিত্যকে এইভাবে দেখিতে হইবে যে, বিশ্বমানব রাজমিস্ত্রি হইয়া এই মন্দিরটি গড়িয়া তুলিতেছেন; লেখকেরা নানা দেশ ও নানা কাল হইতে আসিয়া তাহার মজুরের কাজ করিতেছে। সমস্ত ইমারতের প্ল্যানটা কী তাহা আমাদের কারো সামনে নাই বটে, কিন্তু যেটুকু ভুল হয় সেটুকু বার বার ভেঙে পড়ে; প্রত্যেক মজুরকে তাহার নিজের স্বাভাবিক ক্ষমতা খাটাইয়া, নিজের রচনাটুকুকে সমগ্রের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া, সেই অদৃশ্য প্ল্যানের সঙ্গে মিলাইয়া যাইতে হয়, ইহাতেই তাহার ক্ষমতা প্রকাশ পায় এবং এইজন্যই তাহাকে সাধারণ মজুরের মতো কেহ সামান্য বেতন দেয় না, তাহাকে ওস্তাদের মতো সম্মান করিয়া থাকে।... আমার উপরে যে আলোচনার ভার দেওয়া হইয়াছে ইংরেজিতে আপনারা তাহাকে Comparative Literature নাম দিয়াছেন। বাংলায় আমি তাহাকে বিশ্বসাহিত্য বলিব।"

ভারতবর্ষে তুলনামূলক সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে একদা যে নতুন ধারার চিন্তাচেতনার সূচনা হয়েছিল তার প্রমাণ মেলে মধুসূদন দত্তের সাহিত্যে। স্মরণীয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধে সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা

করেছেন, কিন্তু তিনি গ্রীক, লাতিন, ইংরেজি, সংস্কৃত সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে তুলনামূলক সাহিত্যের ব্যাপক প্রান্তরে পা ফেলেননি। বিদ্যাসাগরও বঙ্কিমচন্দ্রের মতো ইংরেজি, সংস্কৃত ও বাংলাভাষার চর্চার মাধ্যমে বাংলা ভাষা ও গদ্য সাহিত্যের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। তাঁরই সমসাময়িক অক্ষয়কুমার দত্ত বেশ কয়েকটি ভাষা শিক্ষা করে তুলনামূলক সাহিত্যের চর্চার বেশ কিছু নমুনা রেখেছেন, কিন্তু তিনি সেই অর্থে তুলনামূলক সাহিত্য সম্পর্কে তেমন কিছু রচনা করে যাননি। বর্তমানে তুলনামূলক সাহিত্য নতুন মাত্রায় উপনীত হয়েছে। পূর্বে যে পদ্ধতিতে বিশ্বসাহিত্যের চর্চা হতো তুলনামূলক সাহিত্যের মাধ্যমে সেটি ক্রমে একটি সুশৃঙ্খল রূপ পেয়েছে। তদুপরি বাংলাদেশে তুলনামূলক সাহিত্য চর্চা এখানো অবধি একটি কাঠামো লাভ করেনি। মূলত এর উদ্দেশ্য ও পদ্ধতিগত বিষয়ে এখন পর্যন্ত সচেতনতা তৈরি হয়নি এবং এটি চর্চার ক্ষেত্রও সীমাবদ্ধ।

তুলনামূলক সাহিত্যকে একটি আন্দোলন হিসেবে কেউ কেউ চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। কারণ দুশো বছরের মজ্জাগত সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারছে না আমাদের বিদ্যায়তনিক শিক্ষাব্যবস্থা। 'হ্যামলেট'-এর ভূত বজ্রনাদে ঘুরে ফিরছে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশরুমগুলিতে। "To be or not to be" যতখানি হ্যামলেটকে ভাবিয়ে তুলেছিলো, তারও চেয়ে বেশি ভাবিয়ে তুলেছিলো আমাদের ইবসেনের "জ্যান্ত" ভূত। অথচ হ্যামলেটের শিক্ষক-শ্রোতাবৃন্দ কিন্তু ক্লাসরুমে এ-বিষয়ে নীরব নির্বিকার। এই নীরব-নির্বিকার মুখের সমানে আনা যেতে পারে সেই তুলনার আয়না যেখানে সে কেবল নিজের মুখই দেখবে না— দেখবে তার পটভূমি এবং দৃষ্টির সীমা পেরিয়ে সে অর্জন করবে সেই দৃষ্টি—যেখান থেকে মানুষ নামের প্রত্যয়টির একটি সর্বাজনীন বাস্তবতা আবিষ্কৃত হয়। সীমানা-সীমান্ত ভেঙে বা পেরিয়ে একটি মহাজাতিসদনে মানুষকে দেখতে পাওয়ার পথটি তুলনামূলক সাহিত্যের অন্যতম লক্ষ্য।

সাহিত্য যদিও আপাতভাবে একটি বিশেষ ভাষায় রচিত হয়, কিন্তু এর উপজীব্য বিষয়াবলি সীমানা পেরিয়ে যায়। তাই তুলনামূলক সাহিত্যের উদ্দেশ্যর মধ্যে দিয়েই আদতে সাহিত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্যের দিকে যাওয়া যায়। কারণ "দেশ-কাল-মাটি-শিকড়-ভাষা সাহিত্যসৃজনে সূচনার কথা বললেও সারকথা কখনোই তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় একটা "other"-এর চিন্তন নিরন্তর ক্রিয়াশীল শিল্পীর নির্মাণকর্মে। সূচনায় অবলম্বন যদিও কংক্রিটাইজেশনের কথা বলেও, 'other'-এর প্রভাবে সৌরভ-রসায়নে তা গৌণ হয়ে পড়ে। এইভাবেই দেশ- কাল-জাত-পাত-চিহ্নিত অঞ্চলিক মানুষ হয়ে যায় বিশ্বমানব, যার একমাত্র পরিচয় সে মানুষ- এ যেন সাকার থেকে নিরাকারে লীন হওয়া। মনুষ্য নামক প্রাণীর জীবনরহস্য উন্মোচনের অন্তহীন শৈল্পিক প্রচেষ্টাই সাহিত্যকর্ম। সুতরাং ঐ "other"-এর মধ্যেই নিহিত তুলনামূলক সাহিত্যের প্রাণবায়ু— "অন্য কোনোখানে"।... অন্য কোথায়? কীভাবে পৌঁছানো যাবে সেখানে? — তারই সন্ধানে তুলনামূলক সাহিত্যচর্চার প্রয়াস। সাহিত্য পাঠের আধুনিকতম পদ্ধতি।"

তুলনামূলক সাহিত্য বিষয়টি একটি গবেষণাও। এটা কেবল কিছু তথ্যসূত্র 'জানা' বা বিদ্যার্জন নয়। এটি পদার্থবিদ্যায় বস্তুর ধর্ম ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কিত সূত্রাদি জানার মতোও নয়। তদুপরি, তুলনামূলক সাহিত্য মানেই একটি সমন্বিত পাঠ, যেখানে নানান সাহিত্যকীর্তির বিষয় আঙ্গিক রীতি শৈলী, সাহিত্যশিল্প আন্দোলন থেকে শুরু করে এর পটভূমিতে থাকা সমাজ মানুষ, রাজনীতি অর্থনীতি নৃতত্ত্ব তথা সংস্কৃতি নির্মাণের প্রতি বিষয় জড়িয়ে যায়। যেমন, থিওডর ড্রেইসার-এর 'অ্যান আমেরিকান ট্রাজেডি' উপন্যাসটি বুঝতে হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমাজ

ব্যবস্থার ও অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিমানুষের অবস্থানটি সম্পর্কে অবগত হতে হয়, নইলে ওই উপন্যাসের ট্রাজেডি"র মূল ব্যাপারটি উপলব্ধ হয় না। আর কেবল সংস্কৃতি ও ইতিহাসই বিবেচন করা নয়, তা বর্তমানকালের ভেতর দিয়ে "vision of the future development of the society" — হয়ে উঠবে সেটিও এর অন্যতম লক্ষ্য।

অন্যদিকে, তুলনামূলক সাহিত্যের সঙ্গে সাহিত্যতত্ত্বের সম্পর্কটিকেও খতিয়ে দেখতে হয়। কারণ তুলনামূলক সাহিত্য বিচারে সাহিত্যতত্ত্ব ছায়ার মতো কাজ করে। খুব সচেতনভাবে ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত সূত্র ব্যতিরেকে তুলনামূলক সাহিত্যের আলোচনা করা যায় না। যদিও কালে কালে তার নানান পরিবর্তন হয়। বরাবরই নতুন নতুন জীবনভাবনা ও দর্শন সাহিত্যের মাপকাঠি বদলে দেয়। সেদিক থেকে সাহিত্যের তুলনামূলক বিচারে সাহিত্যতত্ত্ব কাজ করে।

সাহিত্য বিচারের ধারণা তো হঠাৎ করে তৈরি হয়নি— এর একটা দীর্ঘ পরম্পরা আছে। সাহিত্য বিচরের পদ্ধতিরও ঐতিহাসিক ভূমিকা আছে সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে। তুলনামূলক সাহিত্য বিচরের ক্ষেত্রে এর সঙ্গে আরো জড়িয়ে পড়ে ভাষাতত্ত্ব, চিহ্ন বিদ্যা, নন্দনতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান এবং মনস্তত্ত্ব। একজন তুলনামূলক সাহিত্য আলোচক জানাচ্ছেন যে—

> "The theoretical study of literature examines literary phenomena in their general and systematic aspects, as well as the methodology of the study of literature and its relations with such disciplines as linguistics, semiotics, aesthetics, sociology and psychology."

তুলনামূলক সাহিত্যর আরো একটি দিক হল, এটি কোনো টেক্সট-এর ঐতিহাসিকতা বা এই টেক্সট নির্মাণের পেছনে যে ঐতিহাসিক পটভূমি বিদ্যামান থাকে সেটি পরীক্ষা করে দেখে। কোন পরিস্থিতিতে সেই টেক্সট কোনো একটি ভাষায় গড়ে ওঠে, এবং পরবর্তীকালে অন্য কোনো ভাষা-সাহিত্য সংস্কৃতিতে কোনো প্রেক্ষাপটে তার অনুবাদ চাহিদা দেখা দেয় এবং তা কীভাবে তৎকালীন চিন্তা জগতে প্রভাব ফেলে, সাহিত্য চর্চায় নতুন কোনো সম্ভবনার জন্ম দেয় কিনা তা খতিয়ে দেখে। তার সঙ্গে উল্লেখিত ভাষাতত্ত্ব, চিহ্নবিদ্যা এবং জ্ঞানচর্চার অন্যান্য শৃঙ্খলা বিজড়িত হয়। তবে এতে বিরাট ভূমিকা পালন করে অনুবাদ সাহিত্য। দৃষ্টান্ত হিসেবে হেনরিক ইবসেন ও অগাস্ট স্ট্রিন্ডবার্গের নাটকের কথা বলা যেতে পারে। এঁদের দুজনের নাটক বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হওয়ার পর বিশ্বনাট্য আর আগের মতো থাকে না,

একথা বিশ্ববিদিত যে—

> "Two Scandinavian writers were largely responsible for the pre-Modernist style of naturalistic realism that came into vouge late in the nineteenth century."

এরই সঙ্গে যোগ করে ইবসেন সম্পর্কে বলা হয়েছে, "The Norwegian dramatist Henrik Ibsen (1828-1906) revolutionised European drama into the style of Modern prose plays that

have dominated the twentieth century." একই ঘটনা ঘটে ব্রেখট-পরবর্তী নাট্যকলায়; তাঁর ক্ষেত্রে বলা হয় যে,' Bertolt Brekhet was the most successful explicitly Modernist dramatist. A Marxist, he appropriately maintained that the purpose of art was not to reflect social conditions but to attempt to change them, ... Brechtóós approach in his own plays, which intenationally alienated the audience from the characters and conditions they saw on the stage...the formal incarnation of the Modernist desire to remake life or at least to mark life strange to audience—to denaturalise the status quo.

তুলনামূলক সাহিত্যে কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে বিশ্বনাট্যর আদল, এর দৃষ্টান্ত কালকেন্দ্রিক ও কালানুক্রমিক দুভাবেই পাওয়া যায়। একইভাবে কবিতা, উপন্যাসে ও ছোটগল্পেরও পরিবর্তন ঘটেছে, পরিবর্তন ঘটেছে এর বিষয়ে ও আঙ্গিকে। এলিয়ট, ইয়েটস, পাউন্ডের পর কবিতা আর আগের মতো থাকে না। ফ্রানস কাফকা ও হোর্হে লুই বোর্গসের পর ছোটগল্পের বিষয় ও আঙ্গিককে বিবেচনায় বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে, বদলে গেছে ছোটগল্প। জেমস জয়েস ও মার্সেল গ্রুস্তের পর উপন্যাসের মাধ্যমে ভিন্ন এক ধারার জীবন-পাঠ হাজির করেন ফ্রানৎস কাফকা। কারণ, "Joyce's comedic inflection of this was not the only possibility. Kafka was the obverse. Whereas Joyce's apparent verbal destiny is ultimately transparent, allowing the reader to process its world and know there are no other transcendental meanings, Kafka's enigmatic simplicity incites interpretation, a need for meaning, only to frustrate it, The anguish of Kafka's fiction, whatever its other causes or implications, comes from a desire still to find, rather than create, a meaning. এঁদের পরবর্তীকালে জাঁ পল সাত্র, আলবেয়ার কাম্যু তাঁদের সাহিত্যে যেভাবে মানুষ ও জীবনবে উপস্থাপন করেন তারপর উপন্যাস আর আগের ধারায় বিদ্যামান থাকে না। পরবর্তীকালে তাও ভেঙে নতুন আরেক ধারার উদ্ভব হয়। আলী রবগ্রিয়ে, ক্লদ সিমো-এর মতো লেখকরা নব-উপন্যাসের ধারায় নতুন আরেক ভাঙচুর ঘটান।

এসব ঘটনা সাহিত্য ও এর চর্চাকারীদের প্রভাবিত করে। অন্যদিকে আছে নানান দার্শনিক মতবাদের প্রভাব। যে মার্কসবাদকে বলা হয় "দ্য থিওরি অব অল সিজন", তাতেও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। মার্কসবাদের প্রভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক জগতের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে নতুন নতুন চিন্তা ও চর্চার অবির্ভাব ঘটেছে। সেই সঙ্গে দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধ, দেশে দেশে স্বাধীনতা, স্বাধীকারের সংগ্রাম, উপনিবেশগুলোর স্বাধীনতা ও নব্য-উপনিবেশবাদ, বর্ণবাদ, সেই সঙ্গে নারীমুক্তি আন্দোলন, যৌন-স্বাধীনতা, রাজনৈতিক ও ধর্মবিশ্বাসের পরিবর্তন, দেশান্তর, অভিবাসন সাহিত্যে নতুন নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

কিন্তু অন্য যেকোনো বিদ্যাচর্চার ধারা মতো তুলনামূলক সাহিত্যও একই ধ্যান ধারণায় পড়ে থাকেনি। সময় ও যুগের বদল অনুযায়ী এরও পরিবর্তন ঘটেছে। বিশেষ করে বিশ্বসাহিত্যের নামে অনির্দিষ্ট ক্ষেত্রটিকে একটি পদ্ধতিগত রূপ দিতে তুলনামূলক সাহিত্যে নতুন নতুন বিবেচনা ও প্রস্তবনা উপস্থাপিত হয়েছে এবং এই প্রক্রিয়া

এখনো চলমান। তুলনামূলক সাহিত্যের সমকালীন বিবেচনাটি বহুমাত্রিক হলেও অধুনা তার একটি রূপরেখা এভাবে চিহ্নিত করার দিকে প্রস্তাব করা যায়, প্রস্তাবটি গায়েত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের বিচার বিশ্লেষণ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এটি হল তুলনামূলক সাহিত্য বিষয়ে হাল আমলের প্রস্তাবনা—

১. ঔপনিবেশিক সাহিত্যিক-পাঠ।

২. উত্তর-ঔপনিবেশিক সাহিত্যিক-পাঠ। এবং

৩. উত্তর-ঔপনিবেশিকতার মধ্যে বিরাজমান ঔপনিবেশিক মানসিকতার সাহিত্যিক-পাঠ/ঔপনিবেশোত্তর ব্যবস্থায় বিরাজমান ঔপনিবেশিক মানসিকতার সাহিত্যিক-পাঠ। এতে সাহিত্যের ভিত্তিতে রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতের বদলটিকে শনাক্ত করার প্রয়াস বিশেষ হয়ে ওঠে।

প্রায় তিন দশক ধরে গায়েত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক প্রথাগত সাহিত্যপাঠের যাবতীয় নিময়কানুনকে অগ্রাহ্য করে আসছেন; হানা দিয়েছেন শৃঙ্খলাবদ্ধ যে জ্ঞানকাণ্ড তার ভেতরের বিধিবিধান ভেঙে। বিশ্বসাহিত্য বা তুলনামূলক সাহিত্য পাঠ ও সাংস্কৃতিক-চৈতন্যের ক্ষেত্রে তিনি হয়ে উঠেছেন সাম্প্রতিক সময়ের অগ্রগামী চিন্তকদের একজন। ডেথ অব অ্যা ডিসিপ্লিন গ্রন্থে তিনি তুলনামূলক সাহিত্যকে বিদ্যায়তনিক শৃঙ্খলায় (একাডেমিক ডিসিপ্লিন) যেভাবে এতদিন বিচার করে আসা হচ্ছিল, তিনি এর মৃত্যু তথা একে অকার্যকর হিসেবে ঘোষণা করেন। এর মাধ্যমে তিনি নতুন তুলনামূলক সাহিত্য পাঠের আহ্বান জানান, যার ভেতর দিয়ে এই শৃঙ্খলাটি নতুন জীবন ফিরে পেয়েছে। এতে করে বাজারি বা পণ্যবিপননীর ব্যবস্থার অনুগামী হওয়া থেকে এর মুক্তি মিলেছে।

বিশ্বায়নের ফলে ব্যাপকভাবে অনুবাদ সাহিত্যের প্রবল জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। অনুবাদ সাহিত্যের বাজারে চাহিদাও ক্রমগত বেড়েছে। আবার বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে চর্চার ক্ষেত্রে ভাষা ও সাহিত্যের বহুমুখীতা কীভাবে রক্ষিত হবে? স্পিভাক এই গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে সেই নির্দেশনা দিতে চেয়েছেন— যাতে সমালোচকরা, যারা সামাজিক ন্যায় সম্পর্কে আগ্রহী, তাদের উচিত সাহিত্যের আঙ্গিকের নিবিড় পাঠের ভেতর দিয়ে সেটিকে শনাক্ত করা। যোশেফ কনরাডের "হার্ট অব ডার্কনেস" এবং ভার্জিনিয়া উলফের "অ্যা রুম অব ওয়ানস অউন" নতুন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পাঠের প্রয়োজনীয়তার জন্য তিনি প্রস্তাব করেছেন। কেবল ইংরেজি, ফরাসি ও জার্মান ভাষায় সাহিত্য পাঠই নয়, সেই সঙ্গে আরবি এবং বাংলাভাষায় নিবিড় ও অনুপুঙ্খভাবে সাহিত্য পাঠের ভেতর দিয়ে সেটি সম্পন্ন হওয়া দরকার বলে তিনি মনে করেন। নিজের দিক থেকে তিনি যা বলেন, সে অনুযায়ী চলছে তাঁর সেই অনুশীলন এবং চর্চা।

তাঁর এই বইটি খুব একটা সহজবোধ্য নয়, বিশেষ করে স্পিভাক নিজে যে বিষয়গুলো অনুধাবন করেছেন এবং যেভাবে বিষয়গুলো উপস্থাপন করেছেন, তাতে বিশ্বসাহিত্য পাঠে কোনো বিশৃঙ্খল ধ্যানধারণার অবকাশ থাকে না। তিনি বলেন যে, 'no more than scattered speculations' (তিনি এর পর্যায়গুলো চিহ্নিত করে দিতে চান এবং সেই পর্যায় অনুযায়ী সাহিত্যকে সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে চান, কারণ উপনিবেশ এবং উপনিবেশ পরবর্তী বাস্তবতাকে সুস্পষ্ট করে আলাদা না করলে, পশ্চিমী মানবতা- যা সাহিত্য পাঠের ভেতর দিয়ে প্রতীয়মান হয়— সেখানে বড় একটা ফাঁক থেকে যাবে)। তিনি বিষয়ভিত্তিক পাঠ (Area Studies) এবং

সাহিত্য পাঠে সীমানা অতিক্রমকরণ (Crossing Borders) কে একযোগে ব্যবহার করে নতুন তুলনামূলক সাহিত্যর যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। এই নতুন তুলনামূলক সাহিত্যের অভিজ্ঞান (hallmark) হবে "ভাষা ও বাগভঙ্গির প্রতি বিশেষ যত্নশীল" ধারাটি এবং একই সঙ্গে স্পিভাক পূর্বেকার তুলনামূলক সাহিত্য পাঠের সেরা বিবেচনাগুলো এবং সার-নির্যাসগুলোও যাতে অবহেলিত না হয়— সেদিকটাতেও নজর রাখতে বলেন। এর ভেতরে কোনো টেক্সটের যতটা সম্ভব নিবিড় পাঠ সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। ভার্জিনিয়া উলফের বরাত দিয়ে তিনি ধরিয়ে দিতে চান যে, অনেক গবেষকও কী করে সেই নিবিড় ও যত্নশীল পাঠটি সম্পন্ন করতে হয় সে-ব্যাপারে সচেতন নন।

আবার শিক্ষা ব্যবস্থার উচ্চমাধ্যমিক পর্যায় থেকে সাহিত্য পাঠ বিষয়ে নতুন বিবেচনাগুলোর চর্চা শুরু করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়। কারণ কল্পনার চর্চা, যাকে ইংরেজিতে বলা যেতে পারে, "the role of teaching literature as training the imagination"-এর প্রশিক্ষণটি এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। তুলনামূলক সাহিত্য বিষয় পাঠে তিনি একটি শব্দ ব্যবহার করেন teleopoiesis, যার অর্থ দাঁড়ায় copying and pasting-এর মাধ্যমে পাঠ সম্পাদনা, যার মাধ্যমে সাহিত্যের আকাশে একসঙ্গে থাকা নক্ষত্রতুল্য কীর্তিমানদের রচনাগুলো পুনর্বিন্যাসের ভেতরে দিয়ে পুনর্পাঠ করা, যাতে নতুন তুলনামূলক সাহিত্য পাঠের এটি একটি অংশ হয়ে ওঠে। আরো একটি বিষয় এই যে, সাহিত্য পাঠের জন্য বাঁক পরিবর্তনের নিয়মটি (the law of curvature)২৩ জরুরি। এর জন্য সাহিত্যের বাঁকবদলের ধারাগুলোও জরুরি। এই বাঁক বদল সরল রেখায় ঘটে না। এটি অন্য সাহিত্য পাঠে সরাসরি ঢুকে পড়াটা সহযোগিতা করে না, এর জন্য চাই সাহিত্যের বাঁকবদলগুলিকে শনাক্তকরণ।

তিনি যোশেফ কনরাডের "হার্ট অব ডার্কনেস"-কে নতুনভাবে ব্যাখ্যার ভেতর দিয়ে কল্পনার নতুন সেই মাত্রাটি উপস্থাপন করেন, যেটি পরবর্তীকালে তায়েব সালেহ-এর "দ্য সিজন অব মাইগ্রেশন টু নর্থ" এবং মহাশ্বেতা দেবীর "টোরোড্যাকটিল, পূর্ণ সহায় ও পৃথা" মাধ্যমে দৃষ্টান্ত-পাঠ হিসেবে তুলে ধরেন।

ক. "হার্ট অব ডার্কনেস"-এর সাধিত হয়েছে "ঔপনিবেশিক সাহিত্যিক-পাঠ"।

খ. "দ্য সিজন অব মাইগ্রেশন টু নর্থ"-এ সাধিত হয়েছে "উত্তর-ঔপনিবেশিক সাহিত্যিক-পাঠ"। এবং

গ. "টোরোড্যাকটিল, পূর্ণ সহায় ও পৃথা"-য় সাধিত হয়েছে "উপনিবেশোত্তর ব্যবস্থায় বিরাজমান ঔপনিবেশিক মানসিকতার সাহিত্যিক-পাঠ"।

যোসেফ কনরাডের "হার্ট অব ডার্কনেসে"র সূত্র ধরে তিনি দেখাতে চেয়েছেন স্বভূমির লোককে কীভাবে কল্পনা করানো শেখাতে হয়, যেভাবে একজন মার্কিন নাগরিক বাংলাদেশের কাউকে শেখাতে চান কীভাবে স্বাধীন চিন্তা করতে হয়। ইংরেজ কবি শেলী বলেছিলেন, 'We want the creative faculty for imagine that which we know.' নিজেদের কল্পনার সীমা কতদূর সেটি জানার এই প্রয়াস তুলনামূলক সাহিত্যের একধরনের কার্যকারিতাটি দেখিয়ে দিতে পারে।

গায়েত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক তুলনামূলক সাহিত্যের পাঠে পৌঁছে যান স্বাধীন বাংলাদেশে। যেখানে তিনি নতুন একটি বাস্তবতার দেখা পান এবং তা থেকে তাঁর উপলব্ধি হয়, 'I cannot help but think that to deny

the privilege of close reading to the texts of the global South is to give in to comparable impulses within the decipline [Comparative Literature].'

একটি একটি করে অঞ্চলকে বোঝার ভেতর দিয়ে বিশ্ব-সম্পর্কে সত্যিকারের পাঠ ও পর্যবেক্ষণ গড়ে তোলা সম্ভব এবং সেক্ষেত্রে তুলনামূলক সাহিত্য বিশেষভাবে সহযোগিতা প্রদান করতে পারে। যেকোনো দেশের সত্যিকারের শিল্প-সাহিত্যের কাজ হচ্ছে, জাতীয়তাবাদী চেতনাকে পুষ্ট করা, এবং এটা কোনো গোপন-গূঢ় বিষয় নয়। এরা দুইয়ে মিলে একটা বিরাট স্মৃতির প্রকল্প গড়ে তোলে, যাতে তারা বলতে থাকে, 'আমরা এভাবে দুর্ভোগ পোহাচ্ছি, তোমরা সবাই মনে রোখে, এ হচ্ছে তাই যা ঘটেছিল, মনে রোখে তোমরা এইসব।' সুতরাং এভাবে ইতিহাস সাংস্কৃতিক স্মৃতিতে পরিণত হয়। সাহিত্য একইভাবে দেখিয়ে দেয় যে, আমরা একই সঙ্গে এক গৌরবময় অতীতের ভেতর দিয়ে এসেছি। জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে একইভাবে অংশ গ্রহণ করেছি। একই ধর্মীয় সহিষ্ণুতার ভেতর দিয়ে পার হয়ে এসেছি। এই হিসেবে দেখানো হয়, সাহিত্যে যে-কল্পনার জন্ম হয় তা জাতীয়তাবাদকে ডি-ট্রান্সেডেন্টালাইজেশন (de-transcendentaliztion) করে এবং বহুপ্রাচীন একটি ধারণাই বার বার সমর্থন পায় যে, "magination feeds nationalism'-তুলনামূলক সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে এ বিষয়টি মনে রাখাটা জরুরি।

যে কটি বিষয় নতুন তুলনামূলক সাহিত্যের উপজীব্য হয়ে ওঠে তার ভেতরে রয়েছে-

১. সাহিত্যের বিষয়ভিক্তিক (এরিয়া স্টাডিজ)।

২. সীমান্ত অতিক্রম করা সাহিত্যের বিচারই তুলনামূলক সাহিত্যে বিবেচ্য।

৩. বিভিন্ন সাহিত্যের বাঁকবদলের বিষয়গুলি শনাক্তকরণ।

৪. সাহিত্যের উপাদান হিসেবে ভাষার বাগভঙ্গি ও প্রবাদ-প্রবচনগুলোকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা।

৫. উপনিবেশ ও উত্তর-ঔপনিবেশিক সাহিত্য পাঠের ভেতর দিয়ে বিরাজমান ঔপনিবেশিক মানসিকতার পাঠসম্পন্ন করা।

৬. কল্পানিক বা শিল্পসাহিত্যে রচনায় জাতিগত চারিত্র্যকে চিহ্নিত করা অর্থাৎ জাতিগতভাবে কল্পনাশক্তির বৈচিত্র্যকে তুলে আনা।

এই প্রবণতাটি ভারতের ঔপনিবেশিক সময়কে বিবেচনা করে কে আয়াপ্পা পানিকার-ও ব্যক্ত করেছেন। পানিকার বলেছিলেন, ঔপনিবেশিক খোঁয়ারি থেকে মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্য থেকেই তুলনামূলক সাহিত্যের পাঠ-পরিকল্পনা করা বাঞ্ছনীয়। স্পিভাকও এ কাজটি কীভাবে সম্পন্ন হতে পারে সে-পথ দেখিয়ে গেছেন। ফলে ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক পাঠের সঙ্গে টেক্সটে বিরাজমান মানসিক প্রবণতার পাঠে ঔপনিবেশিকতা চাপিয়ে দেওয়া বা আরোপিত মনোভঙ্গি থেকে বেরিয়ে আসার প্রানোন্মদনা নতুন তুলনামূলক সাহিত্যের একটি বিশেষ দায় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সেদিক থেকে তুলনামূলক সাহিত্যের পুরোনো ধারাটির দিকে আর একবার নজর দেওয়া দরকার।

এই ধারায় যে-ক'টি বিষয়ে লক্ষ করার প্রবণতা দেখা যায়, সেটি মিলিয়ে নিলেও তুলনামূলক সাহিত্যর পুরানো ও নতুন ধারার পার্থক্যগুলো সহজেই বোঝা সম্ভব।

আগের প্রবণতায় ছিল—

১. মাধ্যমগত শ্রেণীভেদ

২. তুল্য বিষয়ের আপেক্ষিকতা-গত বৈশিষ্ট্য

৩. তুল্য বিষয়ের সংখ্যাগত শ্রেণীভেদ

৪. তুল্য বিষয়গুলোর সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বিচারগত শ্রেণীভেদ

৫. সাহিত্যের আভ্যন্তরীণ অঙ্গগত শ্রেণীভেদ।

এখানে 'মাধ্যমগত শ্রেণীভেদে' মৌখিক ও লিখিত সাহিত্যের তুলনাগত শ্রেণীভেদের কথা বলা হয়েছে। "তুল্য বিষয়ের আপেক্ষিকত-গত বৈশিষ্ট্যে"র ক্ষেত্রে সাহিত্যিকের আপেক্ষিক চেতনা নিয়ে সাহিত্যে রচনার কথা এসেছে, যাতে দেখে নিতে হয়— সাহিত্যিক কতটা অন্য একটি সাহিত্যের ওপর নির্ভর করে তাঁর নিজের সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, নাকি একাধিক সাহিত্য-রচনা সম্পর্কে সচেতন হয়ে নিজস্ব সৃজনের সঙ্গে সেগুলির উপকরণকে একীভূত করে সাহিত্যরচনা সম্পন্ন করেছেন।"

এপ্রসঙ্গে অনুবাদের ধরনের কথাও এসেছে, তা কতটা আক্ষরিক, কতটা আংশিক বা ভাবানুবাদ সেদিকগুলোর দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।

"তুল্য বিষয়ের সংখ্যাগত শ্রেণীভেদ" বলতে তুলনার বিষয়টি সাধারণ ক্ষেত্রগত সংখ্যা দুটো। একটি সাহিত্যের সঙ্গে অন্য সাহিত্যের তুলনাই সেখানে প্রধান, কিন্তু সেটি একাধিক ক্ষেত্রর ভেতরও সম্পন্ন হতে পারে। "তুল্য বিষয়গুলোর সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বিচারগত শ্রেণীভেদ"-এর বিষয়টি তুলনামূলক সাহিত্যের মূল অংশ বলে ধরে নেওয়া যায়। কেননা তুলনামূলক সাহিত্যের প্রক্রিয়াটি কোন কোন ধারা মেনে সম্পন্ন হতে পারে তার এটি তার একটি প্রস্তাবনা বিশেষ, যাতে দেখানো হয়েছে।

ক. একই লেখকের জীবনের বিভিন্ন পর্বের মধ্যে নির্বাচিত একাধিক পর্বের নির্বাচিত গ্রন্থ, গ্রন্থগুচ্ছ বা রচনাগুচ্ছের বিচার।

খ. একই ভাষার ও একই অঞ্চলের সমকালীন একাধিক লেখকের নির্বাচিত গ্রন্থ বা সামগ্রিক রচনাগুচ্ছের বিচার।

গ. একই অঞ্চলের ভিন্নকালীন সামগ্রিক সাহিত্য রচনার বিচার।

ঘ. ভিন্ন অঞ্চলের ভিন্নকালীন নির্বাচিত একাধিক লেখকের গ্রন্থ বা সামগ্রিক রচনাগুচ্ছের বিচার।

ঙ. ভিন্ন অঞ্চলের ভিন্নকালীন সামগ্রিক সাহিত্য রচনার বিচার।

চ. একই অঞ্চলের ভিন্নকালীন সামগ্রিক সাহিত্য রচনার বিচার।

ছ. একই অঞ্চলের অথচ ভিন্নভাষার নির্বাচিত গ্রন্থ বা সামগ্রিক রচনাগুচ্ছের বিচার।

জ. ভিন্ন অঞ্চলের ভিন্ন ভাষার নির্বাচিত গ্রন্থ বা সামগ্রিক রচনাগুচ্ছের বিচার।

ঝ. ভিন্ন অঞ্চলের ভিন্নকালীন ভাষার সমাগ্রিক সাহিত্য রচনার বিচার।

ঞ. সমকালীন ভিন্ন অঞ্চলের ভিন্ন ভাষার সামগ্রিক সাহিত্য রচনার বিচার।

ট. সমকালীন একই অঞ্চলের ভিন্ন ভাষার একধিক লেখকের লেখা নির্বাচিত সাহিত্যগ্রন্থ বা রচনাগুচ্ছের পাঠ।

ঠ. একই অঞ্চলের ভিন্নকালীন ভিন্নভাষার একধিক লেখকের নির্বাচিত সাহিত্য গ্রন্থ বা রচনাগুচ্ছের বিচার।

ড. একই অঞ্চলের ভিন্নকালীন ও ভিন্ন ভাষার সামগ্রিক সাহিত্য বিচার।

ঢ. জয়ন্ত গোস্বামীর মতে, এই তালিকা দৃষ্টান্তমূলক মাত্র এবং একে বাড়ানো চলে। অঞ্চলকে পরিবেশের ভিন্ন, কালসীমার সঙ্কীর্ণতায়, ভাষা সীমার সঙ্কীর্ণতায়- ইত্যাদি বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের বিচারের অবকাশ এসে যেতে পারে। গবেষেকের সূক্ষ্ম শ্রেণীভেদ-চেতনা নতুন নতুন শ্রেণীভেদ সৃষ্টি করতে পারে।'

তুলনামূলক সাহিত্যের কেন্দ্রীয় বিষয় 'একাধিক সাহিত্য রচনার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিষয়গুলো শনাক্ত করা এবং এর তুলনা করা'। একে "সাহিত্যের অভ্যন্তরীণ অঙ্গগত শ্রেণীভেদ" হিসেবে রাখা হয়েছে। একে বিবেচ্য বিষয়গুলো হলো-

ক. সাহিত্যের অন্তরঙ্গগত তুলনা

খ. সাহিত্যের বহিরঙ্গগত তুলনা

গ. বক্তব্যের সঙ্গে রূপায়নের তুলনা

ঘ. লেখকের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্কগত তুলনা।

বলাবহুল্য এগুলিরও উপশ্রেণীগত ভেদ আছে।

লক্ষণীয় এখানে সুনির্দিষ্ট করে নতুন তুলনামূলক সাহিত্যের বিবেচনার অন্যতম প্রধান দিক 'ঔপনিবেশিক মানসিকতা মুক্তির প্রণোদনা' তা আসেনি, আমলে নেওয়া হয়নি কোনো রাজনৈতিক বিবেচনাও। কিন্তু সাহিত্যকে কেবল সাহিত্যের আলংকারিক দিকে রেখে বিচার করলে এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এড়িয়ে গেলে, সাহিত্যবোধনের একটি বড় দিক আড়ালে পড়ে থাকে। জোনাথন সুইফট তাঁর গ্যালিভার্স ট্রাডলসের ভেতর দিয়ে যে ইংরেজের উপনিবেশবাদী তথা সাম্রাজ্যবাদী প্রবণতার বক্রাঘাতকে তুলে এনেছিলেন সেটি আলোচনা থেকে বাদ গেলে- তাঁর এই রচনার মূল ও গভীর উদ্দেশ্যটিই এড়িয়ে যাওয়া হয়। ঔপনিবেশিক শক্তি হিসেবে ইংরেজ তৎকালে কোথাও কোথাও দৈত্যাকায় (গালিভার), কিন্তু সেই দৈত্যাকায় ঔপনিবেশিক শক্তি নব্য- উপনিবেশবাদী মার্কিনী তথা বিশ্ববাণিজ্যের কাছে নিজেই ক্ষুদ্রাকায় (লিলিপুট)- জোনাথন এই ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার কয়েক শত বছর আগে।

কিন্তু সুইফট সম্পর্কে এই ঔপনিবেশিক শক্তির সমালোচনার দিকটি বেশিরভাগ সমালোচনায় প্রায় অনুল্লেখিত থেকে যায়। যেমনটা থেকে যায় ড্যানিয়েল ডিফোর রবিনসন ক্রুশোর উপনিবেশবাদী প্রবণতার সমালোচনা। অতি সম্প্রতি এই সব আলোচনা সূত্রপাত ঘটেছে। বিশেষ করে এডওয়ার্ড সাঈদ এই দিকটি সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি আমাদের সেই বাস্তবতার সম্মুখে দণ্ডায়মান করান যেখানে প্রাচ্যবাদ নামের যে "উপনিবেশিক আকাঙ্ক্ষা" ইউরোপীয় প্রায় সবলেখকের ভেতরে পাওয়া গেছে, তাতে অনেক দিন ধরে প্রচলিত ইউরোপীয় লেখকদের মানবিকতা সম্পর্কে যে-ধারণা, তা নতুন করে প্রশ্ন বিদ্ধ হয়।

সাঈদ প্রাচ্যবাদের আলোচনার শুরুতেই দেখান যে, এটি ইউরোপের আবিষ্কার। 'Orient was almost a European invention, and had been since antiquity a place of romance, exotic beings, hunting memories and landscape, remarkable experiences. ইউরোপীয় মনীষীদের প্রায় সবাই এর গণ্ডির ভেতরে পড়ে গেছেন। যে বিশেষ অর্থে সাঈদ প্রাচ্যবাদকে দেখেন তা নতুন এক মাত্রায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, যাতে দেখা যায়, জ্ঞানচর্চা ও শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে প্রাচ্যবাদ কীভাবে ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে বিজার করেছিল এবং এখনো করছে। 'Orientalism is a style of thought based upon an ontological and epistemogical distinction made between òthe Orient' and (most of the time) "the Occidental". Thus a very large mass of writers, among whom are poets, novelist, philosophers, political theorists, economists and imperial administratiors, have accepted the besic distinction between East and West as the starting point for elaborate theories, epics, novels, social descriptions, and political accounts concerning the Orient, its people, coustoms, "mind", destiny, and so on. This Orientalism can accommodate Aeschylus, say, and Victor Hugo, Dante and Karl Marx'.

এডওয়ার্ড সাঈদের গুরুত্ব সম্পর্কে সিরজুল ইসলাম চৌধুরীর মত, 'তাঁর সবচেয়ে বড় কাজটা হচ্ছে জ্ঞানতাত্ত্বিক ভাবে পাশ্চাত্যের হাতে প্রাচ্যের যে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক লাঞ্ছনা ঘটেছে এবং ঘটছে তার একটি ইতিহাস ভিত্তিক রূপরেখা তুলে ধরা। এই লাঞ্ছনার নাম প্রাচ্যবাদ।'

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, 'প্রাচ্যবাদ জিনিসটা সাঈদের প্রাচ্যবাদ (১৯৭৮) নামে গ্রন্থরচনার আগেও বিদ্যমান ছিল, যেমন মার্কসের আগেও শ্রেণী ছিল। শ্রেণীর ক্ষেত্রে মার্কস যেমন ইতিহাসে শ্রেণীর ভূমিকা নির্দিষ্ট করে দেখিয়েছেন, প্রাচ্যবাদের বেলাতে সাঈদের কাজটাও ওই রকমেরই, তিনি প্রাচ্যবাদের ঐতিহাসিক প্রকৃতি ও তাৎপর্যকে তুলে ধরেছেন, যার ফলে প্রাচ্যবাদ এখন একটি প্রতর্ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। প্রাচ্যবাদকে সাঈদ সংজ্ঞায়িত করেছেন, "সৌন্দর্যতাত্ত্বিক, বিদ্যাভিত্তিক, অর্থনৈতিক, সমাজতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক রচনাতে (টেক্সট) প্রাচ্য সংক্রান্ত ভূ-রাজনৈতিক সচেতনতার বিবরণ" বলে। ব্যাপারটা সাংস্কৃতিক, কিন্তু কেবল সাংস্কৃতিক নয়, আদর্শিকও বটে। এবং অবশ্যই রাজনৈতিক। বস্তুত রাজনীতির ব্যাপারটাই প্রধান। কেননা প্রাচ্যবাদের সঙ্গে ক্ষমতার প্রশ্নটি অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কযুক্ত। ঔপনিবেশিক শাসকেরা চেয়েছে বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক ক্ষমতা; যার সঙ্গে ঔপনিবেশিক রাজনীতি অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িত।'

দেখা গেছে, ইউরোপীয়দের মধ্যে যাঁরা দ্রষ্টা লেখক হিসেবে স্বীকৃত, তাঁরা প্রায় সবাই প্রাচ্যবাদী। প্রাচ্যকে যাঁরা হীন এবং ধোঁয়াটে এবং প্রায় অশুভ বিষয়ের উৎসব হিসেবে দেখে থাকেন, তাঁরাই এই বিশেষ শ্রেণীর প্রাচ্যবাদী। সাঈদ এভাবে ইউরোপীয় যৌথঅবচেতন, সাংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রিয়াকর্মে বিদ্যমান প্রাচ্যবাদী মনোভাব তুলে এনেছেন। উল্লেখ্য, 'প্রাচ্য আর প্রাচ্যবাদ কিন্তু মোটেও একবস্তু নয়; প্রাচ্য হচ্ছে জীবন্ত, আর প্রাচ্যবাদ হচ্ছে সেই জীবন্ত সত্তার একটি চিত্রনির্মাণ; যে-নির্মাণ পরিপূর্ণরূপে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং সেই কারণে বিকৃত। উদ্দেশ্যটা জ্ঞানতত্ত্বিক নয়, উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্ঞানকে শাসনকার্যে ব্যবহার করা। এর প্রতিফলন ঘটেছে পাশ্চাত্যের সাহিত্যে। সাহিত্য থেকে এটি ছড়িয়েছে ইউরোপের সচেতন মানুষের ভাবনা ও মননে। মানুষকে মানুষ হিসেবে না দেখলে যেমন সম্পূর্ণটা দেখা হয় না, দেখাটা পার্থিব হয়ে ওঠে না, ইউরোপের চিন্তা দর্শনের গভীরে আছে এমন এক সংকট যার ফলে এর ফাঁদে পড়েছেন ইউরোপীয় সাংস্কৃতির প্রায় প্রতিটি লেখক। তাঁরা নৈর্বক্তিকভাবে জীবনকে দেখেছেন বলে দীর্ঘদিন ধরে অনেকে মনে করে আসছেন, তাদের সেই ধারণাটায় প্রাচ্যবাদী ফাটল দেখা দেয়। একঝলকে তার কিছু দৃষ্টান্ত— নরনারী সম্পর্কে এবং সাহিত্য বিষয়ক ধারণার ক্ষেত্রে লরেন্স অবশ্যই বিপ্লবী, কিন্তু প্রাচ্যবাদের ক্ষেত্রে তিনি খুবই সাধারণ, অত্যন্ত রক্ষণশীল।... লরেন্সের তুলনায় টি এস এলিয়ট কম বৈপ্লবিক; তিনি স্বঘোষিত রাজতন্ত্রী ও রক্ষণশীল। তাঁর লেখাতে প্রাচ্য সম্পর্কে অবজ্ঞা থাকবে সেটা অপ্রত্যাশিত নয়; আর সেটা আছেও, যেমন তাঁর কাব্য নাটক ফ্যামিলি রিইউনিয়ন এবং দি ককটেল পার্টি-তে। মার্জিত ও নারীবাদী লেখক ভার্জিনিয়া উলফের লেখাতেও প্রাচ্যবাদিতার নির্দশন পাওয়া যাবে। টমাস মানের ডেথ ইন ভেনিস-এ প্লেগের কথা রয়েছে। ঔপন্যাসিক জানাচ্ছেন যে, সেই প্লেগ এসেছে এশিয়া থেকে। ডস্টয়েভস্কির ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট উপন্যাসেও একটি প্লেগের উল্লেখ আছে। বাস্তবে নয়, স্বপ্নে। উপন্যাসের শেষে অসুস্থ রাসকলনিকভ একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখছে। সে দেখছে যে পৃথিবী মস্ত বড় এক অভিশাপের মধ্যে পড়েছে; একটি ভয়ঙ্কর, অপরিচিত মড়ক ইউরোপের দিকে ধেয়ে আসছে, আসছে এশিয়ার গভীর থেকে উত্থিত হয়ে। প্রাচ্যবাদ প্রসঙ্গে নেরুদাও অপ্রাসঙ্গিক নন, বিশেষভাবে তাঁর মেময়ার্স-এ বর্ণিত একটি ঘটনার কারণে। প্রাচ্যবাদীদের একজনই হয়ে গেছেন পাবলো নেরুদা, মোটেও স্বতন্ত্র থাকেননি।

এডওয়ার্ড সাঈদের তুলনামূলক সাহিত্য বিচারের মধ্যে দিয়ে সেটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সিরজুল ইসলাম চৌধুরী সাহিত্যসমালোচক হিসেবে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে লেখেন, এডওয়ার্ড সাঈদ সাহিত্যসমালোচক হিসেবেও অসাধারণ। শুধু সাহিত্যসমালোচনাই যদি রেখে যেতেন, তবুও তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকতেন। তাঁর সাহিত্যসমালোচনা হৃদয়গ্রাহী। যুক্তি দিয়ে লেখেন, কখনোই উত্তেজিত হন না, বাগাড়ম্বর নেই, একটানা পড়া যায়, এবং পাতায় পাতায় মৌলিকত্বের সঙ্গে সাক্ষাত ঘটায়, আনন্দিত হতে হয়। সাঈদের মৌলিকত্ব সাহিত্যিক ও সাহিত্যিক রচনার বিচারে প্রকাশ পেয়েছে; বিশেষভাবে তা উজ্জ্বল দুটি ক্ষেত্রে, একটি তুলনামূলক পদ্ধতির প্রয়োগ, অপরটি সাহিত্যকে স্বয়ম্ভু বা স্বয়সম্পূর্ণ জ্ঞান না করে তাকে যুক্ত করে দেখা সংস্কৃতির সঙ্গে।

সংস্কৃতির সঙ্গে সাহিত্যকে যুক্ত করে বিচার করার ফলে সাঈদ যেটা করেছেন তা অভিনব। তাঁর তুলনার ক্ষেত্রটি বিস্তৃত। ফরাসি, জার্মান এবং ইংরেজি সাহিত্য অভিনিবেশী পাঠের ভেতর থেকে সাঈদ তুলে আনেন ভিন্ন এক মাত্রার অনুরণন। কারণ তাঁর তুলনামূলক পাঠে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এর সাংস্কৃতিক দিকটাকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত

করা। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর মতে, "এক্ষেত্রে সাঈদ অনন্য। সাহিত্যের পেছনে যে সমাজ থাকে এটা তো স্বতঃসিদ্ধ; কিন্তু সমাজ নয় কেবল, সংস্কৃতি যে থাকে আরো নিবিড়ভাবে সেটা সাঈদ তাঁর রচনাতে সুন্দর করে দেখিয়েছেন। সংস্কৃতিতে সমাজ থাকে, থাকে রাজনীতি, নৈতিকতা, আদর্শ, এবং সর্বোপরি ইতিহাস। সংস্কৃতির এই ধারণার জন্য সাঈদ গ্রামসির কাছে ঋণী সেটা ঠিক, কিন্তু সাহিত্যপাঠে সংস্কৃতির প্রয়োগে তাঁর নিজস্বতা অনস্বীকার্য। কাজটা তাঁর আগে রেমন্ড উইলিয়ামসও কিছুটা করেছেন, কিন্তু সাঈদ ওই কাজ আরো অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছেন তাঁর নিজের মতো করে। সাঈদ মনে করেন বিবেচ্য রচনাটিকে (টেক্সট) অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পাঠ করতে হবে এবং শুধু রচনার ভেতরে কি আছে তা নয়, যা ইচ্ছে করে দূরে রাখা হয়েছে কিংবা অস্পষ্ট রয়েছে তাকেও লক্ষ্য করতে হবে। কেননা অনুপস্থিতি অকারণে ঘটে না, যে গুপ্ত সেও এমন এমনি গুপ্ত হয়নি, পেছনে নিশ্চয়ই সাংস্কৃতিক কারণ আছে।

সাহিত্যপাঠের নানান অন্ধগলি এখনো বিদ্যমান আছে। সাঈদ এর অনেকস্থানে মুক্তিদানকারীর ভূমিকা পালন করেছেন। 'সাহিত্যবিচারকে সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে তিনি নতুন আলো-বাতাস নিয়ে এসেছেন, তাঁর ক্ষেত্রটিকে দিয়েছেন অনেক বড় করে, তাতে সাহিত্যপাঠের উপকার হয়েছে, সংস্কৃতিচিন্তার যে হয়নি তাও নয়।৪৫

তুলনামূলক সাহিত্যের একটি নতুন দিক তাই সাঈদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গির কারণে প্রসারিত হয়।

সাঈদ করেছেন:

সংস্কৃতি (সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, নৈতিকতা, আর্দশ, ইতিহাস ইত্যাদি) পাঠ্যবিষয়/টেক্সট

আর সেই সূত্রে পাওয়া গেছে—

সংস্কৃতি (সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, নৈতিকতা, আর্দশ, ইতিহাস ইত্যাদি) একাধিক পাঠ্যবিষয়/ টেক্সটগু তুলনামূলক সাহিত্য। একটি নতুন অনুসন্ধানের আলোকে, সুনির্দিষ্ট একটি উদ্দেশ্য নিয়ে তুলনামূলক পাঠই তুলনামূলক সাহিত্য পাঠের সবচেয়ে ফলপ্রসূ বিষয় হয়ে দেখা দেয়। যেমন এডওয়ার্ড সাঈদ "প্রাচ্যবাদ" পশ্চিমা চিন্তক-ভাবুক- লেখকদের কার মধ্যে কীভাবে ছায়া ফেলেছে- সেটি অনুসন্ধান করতে গিয়ে পশ্চিমাদের মানসকাঠামোর এক ঘুণপোকা আবিষ্কার করে দেখিয়েছেন। ঠিক তেমনি গায়েত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক "ঔপনিবেশিক সময়ের আগে ও পরে সাহিত্যের পরিবর্তন" অনুসন্ধান করে পুরোনো তুলনামূলক সাহিত্যের ধারাকে অকার্যকর হিসেবে চিহ্নিত করে নতুন তুলনামূলক সাহিত্য পাঠের আহ্বান জানিয়েছেন। কারণ তুলনামূলক সাহিত্য পাঠ একটি গবেষণা। ফলে গবেষণার একটি লক্ষ্য ঠিক করে না নিলে তা কেবল শৃঙ্খলাহীন পাঠে পরিণত হবে। এমনকি সাহিত্যিক প্রবণতা বিভিন্ন লেখকের মধ্যে অনুসন্ধান করতে গেলে, এমন একটি লক্ষ্য ঠিক করতে হবে যাতে তার ভেতর দিয়ে পুরো লেখকের মনোভঙ্গি এবং সেই মনোভঙ্গি উপস্থাপনে তিনি কী কী কৌশল ব্যবহার করেছেন সেটি বেরিয়ে আসবে। তাই তুলনামূলক সাহিত্য কার্যকর হয় তখনই, যখন 'একটি বিশেষ অনুসন্ধান' এর ভেতরে পরিচালিত হয় এবং এর জন্য শুরুতে দুই বা ততোধিক নমুনা নির্বাচন করতে হবে। যেমন, 'রাষ্ট্র', 'সমাজ', 'ধর্ম', 'পারিবারিক কাঠামো', 'শিক্ষা' প্রভৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান তুলনামূলক সাহিত্য পাঠ ও গবেষণার মাধ্যমে দিয়ে সম্পন্ন হতে।

ফলে তুলনামূলক সাহিত্য এমন একটা নৈতিকতা খুঁজে বের করতে চায়, যেখানে মানবের বৈশ্বিক চারিত্রা সুচিহ্নিত হয়; বিভেদ বৈষ্যমের বিরুদ্ধে প্রথমে চেতনাগত সংগ্রাম এবং পরে তাকে রাজনৈতিক সংগ্রামের দিকে নিয়ে যাওয়া যায়। যেকোনো জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি রক্ষা পরও সমস্ত সংস্কৃতির সঙ্গে ঐক্যবোধ তৈরি করা তাই তুলনামূলক সাহিত্যের পরম লক্ষ্য; সেটি করতে পারলে তা কেবল সাহিত্যপাঠ ও গবেষণা হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকবে না, একটি বৈশ্বিক বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন হিসেবেও পরিগণিত হয়ে উঠবে।

পর্যায় গ্রন্থ ৪

একক-৪

তুলনামূলক নাটকের আলোচনা

আন্তিগোনে

(কাহিনী সংক্ষেপ)

ওইদিপৌসের দুই ছেলে এতেয়ক্লেসআর পলুনেইকেস আর দুই মেয়ে আন্তিগোনে আর ইসমেনে। ছেলে দুটি সাবালক না হওয়া পর্যন্ত তাদের মামা ক্রেয়োন রাজ্যের দেখাশোনা করছিলেন। দুই ভাই যখন বড় হল তখন রাজ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে লড়াই বাধলো এবং এতোয়ক্লেসকিছুদিন রাজত্ব করার পর তার যখন পালা শেষ হল সে রাজ্য ছাড়তে রাজি হলো না ,এই নিয়ে তার সঙ্গে ভাইয়ের বিরোধ সংগঠিত হলে পলুনেইকেস্ আক্রমণ করলেন থীবেস দুই ভাইয়ের মধ্যে প্রবল যুদ্ধের ফলে পরস্পর আঘাতে দুই ভাইয়ের মৃত্যু হল। ক্রেয়োন আবার রাজ্যভার নিলেন এবং ঘোষণা করলেন দেশ রক্ষার জন্য এতোয়ক্লেসপ্রাণ দিয়েছে, তাই তার দেহ সমাধিস্থ করা হবে আর আক্রমণকারী পলুনেইকেসের দেহ হবে শকুন কুকুরের ভোজ্য। পরের দিন এ খবর তার বোন আন্তিগোনের কানে পৌঁছয়। সেই সময় থেকেই এই নাটকের শুরু। আন্তিগোনে তার বোন ইসমেনেকে ভাইদের মৃত্যুর খবর জানায় সেইসঙ্গে একভাইয়ের সম্মানের সঙ্গে সমাধি এবং আর এক ভাইয়ের সমাধি না দেওয়ার বিষয়টিও অবগত করায়, ইসমেনে বলে সে শুধু শুনেছে এক ভাইয়ের হাতে অন্য ভাইয়ের মৃত্যু ঘটেছে আর কোন খবর সে জানে না।তখন আন্তিগোনে বলে সে মৃত দুই ভাইয়েরই প্রাপ্য সমাদর চায় তাতে ইসমেনে সম্মতি জানায়না কারণ ক্রেয়োনের আজ্ঞা তাই তাকে নিরস্ত করা কঠিন।কিন্তু আন্তিগোনে নিজ সিদ্ধান্তে অবিচল।পলুনেইকেসের দেহ সে সমাধিস্থ করবেই যদি তাতে ইসমেনে সঙ্গ নাও দেয় তবুও সে তার ভাইকে সম্মান করবে। ইসমেনে আন্তিগোনেকে বলে -

"আমরা তো নারী
পুরুষের সঙ্গে যুদ্ধ করা আমাদের কাজ নয়
রাজা আমাদের চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী
এ ব্যাপারে তাকে মান্য করাই নিরাপদ
তাই নিহতদের কাছে আমি
ক্ষমা চাই
কিন্তু রাজার আদেশ আমি
অমান্য করতে পারবো না।"

আন্তিগোনে ইসমেনের রাষ্ট্রভীতি দেখে বলে—

"তোর সাহায্য আমি গ্রহণ করবো না।

কিন্তু আমি আমার ভাইয়ের শেষকৃত্য করবই।

তার জন্য যদি মরি সেও সুখ।"

তখন ইসমেনে আন্তিগোনেকে এই সিদ্ধান্ত গোপন রাখতে বললে,আন্তিগোনে জানায় সে গোপনতাকে ঘৃণা করে। রাষ্ট্রীয় ইচ্ছার প্রতি ইসমেনের দুর্বলতা দেখে আন্তিগোনে তাকে ঘৃণা করেছে এবং বলেছে তাদের মৃত ভাইও যদি ইসমেনেকে দেখে ঘৃণা করে তবে অন্যায় হবে না, ভাইয়ের দেহ সমাধিস্থ করলে যদি আন্তিগোনের মৃত্যু হয় তবে সে মৃত্যুও গৌরবের।কোন শাস্তি কোন ভয়ে সে মৃত্যুর পথ থেকে আন্তিগোনে সরবে না। এরপরে নাটকটিতে প্রবেশ করে বৃদ্ধদের কোরাস। ক্রেয়োন এসে তাদেরকে জানালেন যে ওইদিপউসের দুই পুত্র দুজন দুজনের হাতে নিহত সে তাদের জ্ঞাতি সেই অধিকারে আজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত।রাষ্ট্রের নিয়মের প্রতি আনুগত্যই মানুষের মনের সত্যিকার পরিচয়। তাই রাষ্ট্রের প্রধান যদি ভয়ে কথা না বলেন তবে তিনি অবজ্ঞার যোগ্য।রাষ্ট্রের কল্যাণ সকলের কল্যাণ এবং এই নীতি অনুসারে যে নগরের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছে তাকে সসম্মানে সমাধিস্থ করা হবে এবং যে নগরকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল সে হবে শকুন কুকুরের খাদ্য। সকলে ক্রেয়োনের এই নিয়ম বিধি রূপে গ্রহণ করল। ইতিমধ্যে প্রহরী এসে জানায় যে কেউ একজন এসে মৃতদেহের গায়ের ওপর মাটি বিছিয়ে দিয়ে সমাধির কাজ সম্পূর্ণ করতে চেয়েছিল, যে এই কাজটা করেছে, সে কোন চিহ্ন রেখে যায়নি। তখন কোরাসের নায়ক ক্রেয়োনকে বলে এ কাজটা দেবতারা করেনি তো, ক্রেয়োন জানান যে নগর ধ্বংস করতে এসেছিল সে কখনোই দেবতার প্রিয় হতে পারে না,তার ধারণা কেউ তার বিরুদ্ধে আলাদা দল পাকিয়ে তার আদেশ অমান্য করে ষড়যন্ত্র করে গোপনে তার নির্দেশ লঙ্ঘন করেছে এবং এর দণ্ডও পেতে হবে। ষড়যন্ত্রকারীদের এই কাজ যে করেছে তাকে অবিলম্বে খুঁজে আনার নির্দেশ দেন প্রহরীকে। প্রহরী আন্তিগোনেকে নিয়ে প্রবেশ করে এবং আন্তিগোনেকে দেখিয়ে বলে এই সেই মেয়ে যে পলুনেইকেসের মৃতদেহ কবর দেবার চেষ্টা করছিল ঠিক সেই সময় সে তাকে ধরেছে। ক্রেয়োন আন্তিগোনেকে জিজ্ঞাসা করে সে এই কাজ করেছে কিনা তখন আন্তিগোনে স্বীকার করে যে সে ই তার ভাইকে সমাধিস্থ করতে চেয়েছিল। ক্রেয়োন তাকে বলেন যে আন্তিগোনে কি ক্রেয়োনের নিষেধের কথা জানতো না? আন্তিগোনে নির্দধিায় বলে যে না জানার কোন কারণ ছিল না, সে নির্দেশ জেনেই ক্রেয়োনের নির্দেশ অমান্য করেছে কারণ সেই নির্দেশ জেউসের নয়। এজন্য যদি তার দণ্ড হয়,সে সেই শাস্তি সহ্য করতে পারবে কিন্তু সহদর ভাইকে সমাধি দিতে না পারলে সেই যন্ত্রণা তার কাছে আর বেশি দুঃসহ হতো। তখন ক্রেয়োন লক্ষ্য করেন যে আন্তিগোনে আইন অমান্য করেছে সে জন্য সে অনুতপ্ত নয় বরং ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে। সুতরাং সে দুবার অন্যায় করেছে। প্রথমত সে নির্দেশ অমান্য করেছে,দ্বিতীয়ত সে জন্য তার কোন অনুশোচনা নেই বরং সে গর্বিত, তাই তাকে দণ্ড পেতেই হবে। ক্রেয়োনের মনে হয় ইসমেনেও এই ষড়যন্ত্রে অংশভাগী তাই অবিলম্বে তাকেও নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন। ইসমেনেও আন্তিগোনের সঙ্গে শাস্তির অংশভাগী হতে চাইলে আন্তিগোনে বলে আন্তিগোনের প্রস্তাবে সে সম্মত ছিল না। তাই ইসমেনে রাষ্ট্রীয় আইন অমান্য

করার শাস্তিতে ভাগ পেতে পারেনা, ইসমেনে ক্রেয়োনকে মনে করিয়ে দেয় আন্তিগোনে ক্রেয়োনের বাগদত্তা পুত্রবধূ।ক্রেয়োন পুত্র হাইমোনকে বলে যে নারী প্রকাশ্যে তার পিতার আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে সে নারী হাইমোনের শত্রু, তাই তাকে দণ্ড পেতে হবে। যে রাষ্ট্রের নিয়ম ভাঙ্গে, শাসকের বিধি অস্বীকার করে তার জন্য ক্রেয়োনের হৃদয়ে কোন ভালোবাসা নেই, রাষ্ট্র যখন কাউকে শাসনের ভার দেয় তাকে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য কিন্তু আন্তিগোনে সেই শাসনকে লঙ্ঘন করেছে তাই তার শাস্তি অবশ্যই প্রাপ্য। হাইমোন তার পিতাকে জানায় যে সাধারণ লোকে তার পিতাকে ভয় পায় তাই তার পিতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য মতামত দিতে তারা সংকুচিত কিন্তু তারা গোপনে গোপনে ফিসফিস করে যা বলে তা হাইমোন শুনতে পায় এবং হাইমোন বুঝেছে যে সাধারণ লোকে আন্তিগোনের নিষ্ঠুর মৃত্যুর কথা শুনে বেদনার্ত। তারা মনে করে যে আন্তিগোনের এই পবিত্র কাজের জন্য দণ্ড অসঙ্গত বরং রাষ্ট্রের উচিত তার নাম সোনার অক্ষরে লেখা। হাইমোন তার পিতাকে পরামর্শ দেয় ক্রোধ সংযত করতে, যে সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছেন সেই সিদ্ধান্তকেই চরম বলে যেন গ্রহণ না করেন।তখন ক্রেয়োন বলেন যে হাইমোনের সঙ্গে আন্তিগোনের বিবাহ হবে না, এ কথা শুনে হাইমোন জানিয়ে রাখলেন যে যদি আন্তিগোনের মৃত্যু হয় তাহলে শুধু তার একার মৃত্যু হবে না। ক্ষমতার ভারে দাম্ভিক ক্রেয়োন পুত্রের সামনেই আন্তিগোনেকে হত্যা করতে চাইলে হাইমোন প্রস্থান করে। ক্রেয়োন নির্দেশ দিলেন আন্তিগোনেকে এক জনশূন্য পাহাড়ের গুহার ভেতরে অবরুদ্ধ করতে এবং সঙ্গে কিছু খাদ্য দিতে যাতে স্ত্রী হত্যার পাপ ক্রেয়োনের রাষ্ট্রকে স্পর্শ না করতে পারে। আন্তিগোনে নিজের কর্মের জন্য নিজেকে পুরস্কৃত করতে থাকে,

"আমার যুক্তি স্বামীহীন হলে পেতে পারি আমি স্বামী। পুত্র হারালে আমি
পেতে পারি আরেকটি সন্তান,ভাইকে হারালে কোথাও ফিরে পাব ভাই?"

আন্তিগোনে ধীরে ধীরে প্রস্থান করে সকলে তাকে বিদায় জানায়। এরপরে এক বালকের হাত ধরে অন্ধ ভবিষ্যৎবক্তা তেইরেসিয়াস প্রবেশ করেন। তিনি ক্রেয়োনকে কে জানান যে আজ রাষ্ট্র ভীষণ অসুস্থ আর এর জন্য ক্রেয়োনের বিধান দায়ী, সমস্ত মন্দির, পূজা বেদী আজ অপবিত্র,কারণ পলুনেইকেসের অসৎকৃত দেহের টুকরো টুকরো মাংস শকুন কুকুর সেখানে এনেছে। তিনি পরামর্শ দিলেন মৃতকে সম্মান জানানোর জন্য, কিন্তু ক্রেয়োন তাতে সম্মতি জানালেননা,বরং তেইরেসিয়াসকে অর্থলোভী বলে তিরস্কার করেন,তাই তেইরেসিয়াস ক্রেয়োনকে অভিশাপ দিলেন যে, সূর্যের একটি পরিক্রমা শেষের আগেই ক্রেয়োন সন্তান হারাবে, একটি জীবন্ত প্রাণ সে বন্দী করেছে কবরে,আর একটি শবদেহ মাটিতে ফেলে রেখে মৃত্যুদেবতার অপমান করেছে,এই দুই মৃত্যুর প্রবল মূল্য দিতে হবে ক্রেয়োনকেই।তেরেসিয়াস প্রস্থান করলে কোরাসের নায়ক ক্রেয়োনকে বলে মেয়েটিকে মুক্তি দিতে এবং মৃতদেহ সৎকার করতে তখন ক্রেয়োন বলে সে তার সিদ্ধান্ত বদল করে মুক্তির আদেশ দিচ্ছে। ইতিমধ্যে দূত এসে জানায় যে পিতার বিরুদ্ধে ক্ষোভে ক্রোধে হাইমোন আত্মহত্যা করেছে। ক্রেয়োনের রানী এউরুদিকে দূত বলে যে সে পলুনেইকেসের মৃতদেহ পবিত্র জলে ধুয়ে গাছ থেকে ডাল কেটে চিতা সাজিয়ে দেহের অংশটুকু আগুনে সমর্পণ করে দিয়েছে এবং ছোট স্মৃতিচিহ্ন করে দিয়ে এসেছে,গুহায় বন্দী আন্তিগোনের আর্তনাদ শুনে ক্রেয়োনকে সেই খবর দেওয়া হল তিনি এসে তার পুত্রের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন এবং সবাই তখন গুহার ভেতরে

ঢুকে দেখল আন্তিগোনে আত্মহত্যা করেছে এবং হাইমোন সেই শোকে কাতর।পুত্রকে দেখে ক্রেয়োন তাকে ফিরে আসার জন্য মিনতি জানালেন। কিন্তু শোকোন্মাদ হাইমোন ক্রোধে থুতু ছিটিয়ে কোনো কথা না বলে সে পিতার দিকে তরবারি নিক্ষেপ করে লক্ষ্যভ্রষ্ট হাইমোন নিজের শরীরকে তরবারিবিদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করেছে, দূতের মুখে পুত্রের আত্মহত্যার সংবাদ শুনে রানী কোন কথা না বলে নিঃশব্দে প্রস্থান করলেন, এরপর ক্রেয়োন যখন অপরাধবোধে জর্জরিত তখন দূত তাকে আরেকটি আত্মহত্যার সংবাদ শোনায় সেটি তার রানী এউরুদির।ক্রেয়োনের নিজকর্মের জন্য অনুশোচনাতেই এ নাটকের পরিসমাপ্তি।

হ্যামলেট

(সংক্ষিপ্তসার)

উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের দীর্ঘতম ট্র্যাজেডি নাটক 'হ্যামলেট'। এর রচনাকাল সঠিক জানা না গেলেওঅনুমান করা হয় ১৫৯৯ থেকে ১৬০৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এটি রচিত হয়েছিল। 'হ্যামলেট' নাটকটির বর্ণনাভঙ্গি সেই সময়কার রচনাগুলির বর্ণনাভঙ্গি থেকে আলাদা।ধারণা করা হয়, স্যাক্সো গ্রামাটকাসের রচিত 'এমলেথ' নামক একটি লোককাহিনির উপর ভিত্তি করেই শেক্সপিয়ার 'হ্যামলেট' নাটকটি রচনা করেন।

'হ্যামলেট' নাটকের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে মৃত চরিত্র ডেনমার্কের রাজা হ্যামলেটের প্রতিশোধ পরায়নতার চিত্রের মধ্যে দিয়ে। নাটকের শুরুতেই দেখা যায় ডেনমার্কের রাজপ্রাসাদের দু'জন প্রহরী প্রাসাদের প্রধান ফটক পাহারা দেওয়ার সময় একটি প্রেতাত্মাকে দেখতে পায়। তারা সেই ঘটনার ব্যাখ্যা জানতেহোরেসিওনামে একজন বিজ্ঞ ব্যক্তিকে ডেকে আনে। 'হ্যামলেট' নাটকের প্রধান চরিত্র হ্যামলেট। যিনি মৃত রাজার একমাত্র পুত্র। রাজা মারা যাবার পর রাজার স্ত্রী অর্থাৎ প্রিন্স হ্যামলেটের মা রাণী গারট্রুডকে হ্যামলেটের কাকা ক্লডিয়াস্ বিয়ে করে নিজেকে ডেনমার্কের রাজা হিসেবে ঘোষণা করেন।পিতার মৃত্যুকালে হ্যামলেট ছিলেন রাজধানীর বাইরে।রাজ্যে ফেরার পর হ্যামলেট এসে দেখেন যে, তার বাবা মারা গেছেন এবং তার মা তারই কাকার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। এই ঘটনা দেখে তিনি ব্যথিত হয়ে পড়েন।

এরপরের ঘটনায় দেখানো হয় হ্যামলেট পলোনিয়াসের কন্যা ওফেলিয়াকে প্রেমের প্রস্তাব দেন। যার জন্যওফেলিয়ার ভাই লেয়ার্টিস্ওফেলিয়াকেহ্যামলেটের কাছ থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেন। এরপর আবারও সেই প্রেতাত্মারকাহিনি ফিরে আসে। প্রেতাত্মাকে দেখেছিল রাজপ্রাসাদের দু'জন প্রহরী।সে সম্পর্কে জানতেন হোরেসিও, যিনি হ্যামলেটের বন্ধু।হোরেসিও এই ঘটনা সম্পর্কে হ্যামলেটকে জানালে হ্যামলেট তার সঙ্গে রাজপ্রাসাদের দ্বারে প্রেতাত্মার সাক্ষাৎ পাবার আশায় যান। হ্যামলেট প্রেতাত্মাকে দেখে বুঝতে পারেন এটা তাঁরই বাবা ওল্ড হ্যামলেট। ওল্ড হ্যামলেট তাঁকে বলেন যে, তার মৃত্যু কোনও স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। তাকে হত্যা করা হয়েছে।তার হত্যাকারী ওল্ড হ্যামলেটের ভাই ক্লডিয়াস্। হ্যামলেটের বাবা হ্যামলেটকে দুটো দায়িত্ব দেন। (এক) সে যেন তার বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়। (দুই) সে যেন তার মাকে কোনও রকম কষ্ট না দেয়।

এই ঘটনা সম্পর্কে জানতে পেরে হ্যামলেট একেবারে ভেঙে পড়েন। তিনি পরিকল্পনা করেন যে আগে নিশ্চিত হতে হবে যে তারই কাকা তার বাবাকে হত্যা করেছে কিনা। এই ঘটনার পর থেকে হ্যামলেটের আচরণ কেমন যেন পাগলের মতো হয়ে যায়। তবে হ্যামলেট নিজে ইচ্ছে করেই অনেক সময় উন্মাদের মতো আচরণ করতে থাকেন। রাজ্যের বৃদ্ধ মন্ত্রী পলোনিয়াসের কন্যা অপরূপ সুন্দরী ওফেলিয়া মনে প্রাণে হ্যামলেটকে ভালোবাসত। হ্যামলেটের হাব-ভাব, কথাবার্তায় অস্বাভাবিকতার লক্ষণ দেখা গেছে জানার পর হ্যামলেটের সাথে কন্যার বিবাহের বিষয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন পলোনিয়াস।রাজপ্রাসাদের সদস্যদের উপর কড়া নজর রাখার প্রয়োজনে হ্যামলেট পাগলামীর ভান করতে থাকেন। অসংলগ্ন কথার ফাঁকে ফাঁকে সরস অথচ তীক্ষ্ণ মন্তব্য করেন হ্যামলেট। যাতে রাজা, রানী, পলোনিয়াস সবাই মনে তীব্র বেদনা পান।

হ্যামলেট বুদ্ধি দিয়ে স্থির করেন রাজপ্রাসাদে নাটকের অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে রাজা রানির মনোভাব যাচাই করবেন। তাই হ্যামলেট অভিনেতাদের তার লেখা একটি নাটক রাজপ্রাসাদে অভিনয় করার অনুরোধ করেন। এক্ষেত্রে বিষয়বস্তু তো আগে থেকেই স্থির ছিল। বাবার প্রেতাত্মার মুখে যে কাহিনি শুনেছিলেন হ্যামলেট, হুবহু তারই আদলে লিখতে হবে নাটক কীভাবে রাজাকে সরিয়ে সিংহাসন দখল করতে রাজার ছোটো ভাইয়ের সাথে রানীর চক্রান্ত, ঘুমন্ত রাজার কানে বিষ ঢেলে তাকে হত্যা করে শূন্য সিংহাসন দখল করাএ সবই থাকবে নাটকে।নাটকের কাহিনি অভিনয় দলের খুবই পছন্দ হয়। তারা চুটিয়ে মহড়া দিতে লাগল। মহলা চলতে চলতে নাটকের দিনক্ষণও স্থির হয়ে গেল।নাটক অভিনয়ের দিন হ্যামলেট শুরুতেই রাজা রানীর খুব কাছে এসে বসলেন। সেখান থেকে পাদপ্রদীপের আলোয় তিনি খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন তাঁদের হাব-ভাব। নাটক এগিয়ে যাবার সাথে সাথে হ্যামলেট স্পষ্ট বুঝতে পারলেন নতুন রাজা ক্লডিয়াসের মুখখানা কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে পড়ছে। এর কিছুক্ষণ বাদে বাগানে ঘুমন্ত রাজার কানে বিষ ঢেলে দেবার দৃশ্যটা যখন সামনে এল, তখন আর সহ্য করতে পারলেন না ক্লডিয়াস। আসন ছেড়ে উঠে তিনি চলে গেলেন প্রাসাদের ভেতরে। হ্যামলেটের এও নজর এড়াল না যে তার মা রানী গারট্রুডও ভেতরে ভেতরে যথেষ্ট অস্থির হয়ে উঠেছেন। এবার আর কোনও সন্দেহ রইল না হ্যামলেটের মনে। তার বাবা তাকে যে সমস্ত কথা বলেছেন তা সবই সত্যি। এবার নিশ্চিত হয়ে নাটক দেখতে দেখতে স্থির করলেন হ্যামলেট, অন্যায়ের প্রতিবিধান করার যে প্রতিজ্ঞা তিনি বাবার কাছে করেছেন তা অবশ্যই তাকে পালন করতে হবে। বাবার হত্যাকারীর সাথে তার যে সম্পর্কই থাকুক না কেন, তিনি নিজ হাতে শাস্তি দেবেন তাকে।

হ্যামলেট তার কাকাক্লডিয়াস তার বাবার হত্যাকারী এই বিষয় নিয়ে মায়ের সঙ্গে আলোচনা চলাকালীন অনুমান করেন তাদের এই আলোচনা পর্দার আড়াল থেকে কেউ শুনছে। সেই মুহূর্তে তিনি তরবারি বের করে পর্দার ওপর চালিয়ে দেওয়ার সঙ্গে দেখতে পান ওফেলিয়ার বাবা পলোনিয়াস তরবারি আঘাতে মারা যান।ওফেলিয়ার বাবা মারা যাওয়ার পর রাজদরবারে একবারে হইচই পড়ে যায়। ওফেলিয়া ও ছলর ভাই একেবারে পাগলপ্রায় হয়ে শেষ পর্যন্ত ওফেলিয়ানিজে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। তার ভাই তাদের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য রাজ দরবারে উত্তেজনা শুরু করেন।ক্লডিয়াস তাঁকে বুঝিয়ে বলেন যে, হ্যামলেট, তার বাবাও তার বোনের হত্যাকারী। এরপর তিনি পরিকল্পনা করে হ্যামলেটকে ইংল্যান্ডে নির্বাসনে পাঠান।সঙ্গে দু'জন গুপ্তচর নিযুক্ত করে দেন। ইংল্যান্ডে যাওয়ার সময় হ্যামলেট তার দুই গুপ্তচরের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলেন। তাদের পকেট থেকে একটি

চিঠি পান হ্যামলেট। যেটা ইংল্যান্ডের রাজার উদ্দেশ্যে লেখা ছিল যে ইংল্যান্ডে হ্যামলেট পৌঁছানো মাত্রই তারা যেন তাকে মেরে ফেলেন। হ্যামলেট তখন সেই চিঠি নিয়ে তাঁর নিজের ঘরে চলে আসেন এবং তৎক্ষণাৎ তিনি আরেকটি চিঠি লেখেন যেখানে বলা হয় ইংল্যান্ডের রাজা যেন হ্যামলেট ইংল্যান্ডে পৌঁছানোর সাথে সাথে দুই গুপ্তচরকে মেরে ফেলে।

ঘটনা অন্যদিকে মোড়নেয় যখন তাদের জাহাজ জলদস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়।আক্রমণে হ্যামলেট নিজেও ইচ্ছায় জলদস্যুদের জাহাজে চলে যান। হ্যামলেটের সুন্দর আচরণের কারণে মুগ্ধ হয়ে জলদস্যুরা তাকে ছেড়ে দেয় এবং হ্যামলেট পুনরায় ডেনমার্কের ফিরে আসে। ক্লডিয়াস যখন দেখলো হ্যামলেট পুনরায় ফিরে এসেছেতখন এক নতুন মতলব আঁটলেন হ্যামলেটকে হত্যা করার। তিনি আয়োজন করলেন তার রাজ্যের ভেতর এক তলোয়ার প্রতিযোগিতার। হ্যামলেট ও লেয়ার্টিস-উভয়েই ভালো তলোয়ারবাজ হিসেবে পরিচিত ছিলেন দেশের অল্পবয়সি যুবকদের কাছে। ক্লডিয়াস স্থির করলেন হ্যামলেটকে মেরে ফেলতে তার এই খ্যাতিকেই তিনি কাজে লাগাবেন। প্রতিযোগিতায় যে তলোয়ার ব্যবহৃত হয় তার ফলা থাকে ভোতা, কিন্তু ক্লডিয়াস লেয়ার্টিসকে বোঝালেন যে তার ও হ্যামলেটের - উভয়ের হাতেই থাকবে ধারালো তলোয়ার, যার ফলা হবে খুবই স চোলো। আর লেয়ার্টিসের তলোয়ারের দুধারে এবং ফলায় মারাত্মক বিষ মিশিয়ে রাখবেন তিনি। সে বিষ এমনই তীব্র যে তার সংস্পর্শে এলেই মৃত্যু অবধারিত। এছাড়া হ্যামলেটের মৃত্যুকে নিশ্চিত করার জন্য অন্য ব্যবস্থাও তিনি করেছেন বলে জানালেন ক্লাউডিয়াস। তলোয়ারের আঘাতে যদি হ্যামলেটের মৃত্যু না হয়, তা হলে মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করতে তার জন্য নির্দিষ্ট শরবতের গ্লাসে মিশানো থাকবে বিষ এ আশ্বাসও তিনি দিলেন লেয়ার্টিসকে। খেলার ফাকে যখন হ্যামলেটের তেষ্টা পাবে, তখন যাতে বিষ মেশানো শরবত তার হাতে তুলে দেওয়া হয়, সে ব্যবস্থাও করে রাখবেন তিনি। খেলার প্রথম রাউন্ড শেষ হবার পর মার কাছে এসে দাঁড়ালেন ক্লান্ত হ্যামলেট। ক্লডিয়াসের দিকে তাকিয়ে বললেন রানি, হ্যামলেট তৃষ্ণার্ত, ওকে শরবত দাও। ঠিক এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন ক্লডিয়াস। সাথে সাথেই তিনি বিষ মেশানো শরবতের গ্লাস রানীর হাতে তুলে দিলেন। কিন্তু রানী সে গ্লাস হ্যামলেটের হাতে দেবার পূর্বেই বেজে উঠল দ্বিতীয় রাউন্ড শুরুর বাজনা। সাথে সাথেই মার কাছ থেকে ছিটকে এসে হ্যামলেট দাঁড়ালেন খেলার জায়গায়। সেখান থেকে চেঁচিয়ে মাকে বললেন খেলার শেষে তিনি শরবত খাবেন। শুরু থেকে একইভাবে খেলা দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়েছেন রানি। তাই শরবতের গ্লাসটা রাজাকে ফিরিয়ে না দিয়ে তিনি নিজেই কয়েক চুমুকে খেয়ে ফেললেন শরবতটুকু। ক্লডিয়াস স্বপ্নেও ভাবেননি যে এরূপ ঘটনা ঘটতে পারে। কিন্তু তখন আর কিছু করার নেই। বুকে একরাশ উত্তেজনা নিয়ে ক্লডিয়াস এক মনে খেলা দেখতে লাগলেন। হ্যামলেট তার তলোয়ারের আঘাতে ফেলে দিলেন লেয়ার্টিসের হাতের তলোয়ার। লেয়ার্টিসের তলোয়ারটা মাটিতে পড়ে যেতেই সেই বিষমাখানো তলোয়ার তুলে নিয়ে হ্যামলেট বসিয়ে দিলেন লেয়ার্টিসের বুকে। রানী বিশ মেশানো পেয়ালা থেকে মদ পান করলো এবং মৃত্যু যন্ত্রণায় ভুগতে লাগলেন। সে সময় সে তার পুত্র হ্যামলেটকে বললেন যে এইসব ষড়যন্ত্রের মূল পরিকল্পনাকারী হচ্ছে তার কাকা এই কথা বলে তার মা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। হ্যামলেট ক্ষিপ্ত হয়ে বিষ মাখানোর তরবারি দিয়ে তার কাকাকে আক্রমণ করেন। এই পরিস্থিতিতে হ্যামলেট, তার মা, কাকা এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী লেয়ার্টিস মৃত্যুবরণ করেন। শুধু বেঁচে রইল হোরেসিও ও ফর্টিন্‌ব্রাস নামক চরিত্র।

শেষ পর্যন্ত ফর্টিন্‌ব্রাস ডেনমার্কের রাজা হয় এবং নির্দেশ দেন হ্যামলেটের শেষকৃত্য যেন যথাযথ সৈনিকের সম্মানের শহীদ করা হয়।

'চাকভাঙা মধু'
(কাহিনি সংক্ষিপ্তসার)

'মনোজ মিত্রের চাকভাঙা মধু নাটকের প্রথম অংকের শুরুতেই দেখি বিকেলের হলুদ কমল রোদ্দুরে মাতলা ওঝার জন্য কুঁড়েঘরের দাবায় শরীর এগিয়ে আছে বাদামী। বাদামির চোখে মুখে ক্লান্তি কালি পড়া নিষ্প্রাণতা। সেই সময় বাদামের বাবা মাতলা, বাড়ি ঢুকছে। মাতলার চুপশানো পেট রুক্ষ চুল ভাঙাচোরা মুখ অর্ধনগ্ন শরীর মাথায় মুখ বাধা মাঝারি আকারের কলসি। বাড়িতে ঢুকে মাতলা কলসিটা ভাঙাচোরা বাসের মাথার উপর রাখে এবং জাল ও শুড়কি ফেলে দেয়। বাবা বাড়িতে ফিরে আসলে দু রাত্রি অভুক্ত গর্ভবতী বাদামি তাকে জিজ্ঞাসা করে খাবার জোগাড় করতে পেরেছে কিনা এবং কলসিতে সে কি এনেছে তা দেখার জন্য ছুটে যায়। মাতলা তখন বাদামিকে জানায় কলসিতে এক নম্বর জিনিস অর্থাৎ মধু আছে। মধু খাবার জন্য বাদামি কলসির ঢাকা সরাতেই আর্তনাদ করে দূরে ছিটকে পড়ে। কলসির মধ্যে ছিল বিষধর গোখরা সাপ।বাদামী ভয় পেলেও মাতলা থাকে সাহস দেয় যে সাপের কামড়ে, সে মরবে না কারণ তার বাপ ঠাকুরদা সাপের ওঝা। বাদামির বাপ মাতলা চেয়েছে সাপটাকে পোষ মানাতে। মাতলার কাকা জট আরো সাপটা দেখে পছন্দ হয় কারণ তেমন সু-জাতের সাপও বর্তমানে দেখা যায় না। তবে অনাহারে বাদামী ক্ষুধা পেটে বাবা দাদুর সাথে বাকবিতন্ডা শুরু করে এবং বাদামীর গর্ভের সন্তান নষ্ট করবার প্রসঙ্গও উঠে আসে।মাতলা বাদামীকে চড় মারে। পারিবারিক অশান্তির মধ্যেই জটা অঘোর ঘোষের খবর নিয়ে আসে।অঘোর ঘোষের নাম শুনেই ঋণ এবং সুদের কথা চিন্তা করে মাতলা বাদামি দুজনেই ঢাকা দিতে উদ্যত হয়।তবে তার কথায় জানা যায় অঘোর ঘোষ মরতে বসেছে। মাতলা জটা অঘোর ঘোষ মরণাপন্ন খবর শুনে আনন্দিত হয়। তবে বাদামী মরণাপন্ন হওয়ার কারণ জানতে চাইলে মুসলমান চাষী ফুকনা জানায় রাত্রিবেলায় নিদ্রাকালে কালাচসাপে তাকে দংশন করেছে।অঘোর ঘোষকে বাঁচানোর জন্য বাদামী তার পিতাকে বলে। কারণ বাদামী ভাবে এই অভাবের সময় অঘোর ঘোষকে বাঁচালে কিছুটা আর্থিক সুরাহা হতে পারে।তবে মাতলা,জটা বাদামীর কথাতে রাজি নয়। কারণ তারা জানে অঘোর ঘোষ একজন অত্যন্ত নিকৃষ্ট মানসিকতার অর্থ পিশাচ মানুষ। এরপর অঘোর ঘোষের পাতানো বোন দাক্ষায়নী এবং তার সন্তান শংকর বাদামীদের বাড়িতে এসে মাতলা এবং জটাকে অনুরোধ করলে তারা নানান মিথ্যার আশ্রয় নেয়,সময় অপচয় করতে থাকে অঘোর ঘোষকে না বাঁচানোর জন্য। বাদামী নানান ভাবে তার বাবাকে বোঝাতে থাকে।বাদামীর কথায় অর্থ কামানোর জন্য জটা অঘোর ঘোষের প্রাণ বাঁচানোর জন্য উদ্যোগী হয়। তবে ফুকনা জানাই একজনের জন্য গ্রামের সকলের ক্ষতি করলে ভালো হবে না ফুকনার কথাতে জটা মাতলা দ্বিধাগ্রস্ত তখন বাদামী নিজেই অঘোর ঘোষের প্রাণ বাঁচাতে যায়। তা দেখে শেষ পর্যন্ত মাতলায় প্রাণ বাঁচাতে সম্মত হয়।দুজন বেহারা অঘোর ঘোষকে নিয়ে এসে মাতলার বাড়িতে রাখে।

দ্বিতীয় দৃশ্যের শুরুতে মাতলা জটা বাদামি তিনজন উঠানের এক কোণে বসে ভাত খাচ্ছে।বাদামী বাপ দাদুকে তাগাদা দিলেও তাদের কোন তাড়া নেই। তারা সময়ের অপচয় করতেই চায়। বাদামের জেদের জন্য অঘোর ঘোষকে বাঁচাতে রাজি হলেও প্রকৃতপক্ষে তারা অঘোর ঘোষের মৃত্যুই কামনা করেছে।অঘোর ঘোষের বেহারা তাগাদা দিলেও তাই তারা নানান ভাবে সময় কাটাতে থাকে।শুধু তাই নয় নানান বাহানা দেখিয়ে জটা টাকা আদায়ও করতে থাকে। বাদামী তার বাবা ও দাদুর মনোভাব এবং সময় কাটানোর চক্রান্ত বুঝতে পেরে শেষ পর্যন্তসে নিজেরবাবাকে তিরস্কার করে এবং বাপের ওঝা গিরির বিদ্যেকে হেও করে।মাতলা অপমান সহ্য না করে বিষ নামাতে উদ্যত হয়। বৃষ্টি নামানোর মাঝেই আবার অগোর ঘোষের অত্যাচারের কথা যটার কথা শোনার কথায় দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বিষনামানো বন্ধ করে দেয়। বাদামী ও বুঝতে পারে মাতলার দুশ্চিন্তার কারণ। বাদামী সেই সত্য স্বীকার করে অঘোর ঘোষের ছেলে শঙ্করের কাছে।শংকর নিজের বাবাকে বাঁচানোর জন্য বাদামের কথাতে সহমত পোষণ করে তাদের প্রতি সহমর্মিতা দেখায় এবং নিজের পিতার সমস্ত দোষকে মেনে নেয়। শুধু তাই নয় বাদামীকে প্রতিশ্রুতি দেয়, তার বাবাকে বাঁচিয়ে দিলে সে বাদামীকে তার স্বামী হরিশ এবং গর্ভের সন্তানকে নিয়ে সুখে সংসার করার ব্যবস্থা করে দেবে। শংকরের কথায় বাদামী আশার আলো দেখে,শংকরের সহানুভূতিতে বিশ্বাস খুঁজে পায়বাদামী। পুনরায় মাতলাবিষ ঝাড়তে শুরু করে। এরপর সমস্ত বিষ নেমে গেলে অঘোর ঘোষ প্রাণ ফিরে পায়।প্রাণ ফিরে পাবার পর পুনরায় অঘোর ঘোষ তার নিকৃষ্ট দুর্বৃত্ত মানসিকতার পরিচয় দেয়। যে বাদামী তার প্রাণ বাঁচানোর জন্য বাবা ও দাদুর সাথে ঝামেলায় জড়ালো সর্বোপরি তার প্রাণ বাঁচিয়ে তুলল সেই বাদামীর উপরেই সে লালসার দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। মাতলা, বাদামী অঘোর ঘোষকে তাদের উপকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেও পশু প্রবৃত্তির অঘোর ঘোষ উপকারের কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করে বাদামী কে তুলে নিয়ে যেতে চায়। তাই নাটকের শেষে বাদামী আত্মসম্মান রক্ষার জন্য অঘোর ঘোষকে কচ্ছপ ধরা সড়কি দিয়ে আঘাত করে হত্যা করে।

কন্যাদান

(কাহিনী সংক্ষিপ্তসার)

নাটকটি নাথ দেবালীকারের বাড়িতে শুরু হয় যেখানে আমরা নাথেকে দেখি, একজন আদর্শবাদী গান্ধী সমর্থক এবং একজন সক্রিয় সমাজকর্মী এবং সেই সাথে একজন এম.এল.এ। প্রথম থেকেই এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে নাথ একজন আদর্শবাদী। তিনি জ্যোতি এবং জয়প্রকাশের পিতা-যারা নাথের আদর্শবাদী দর্শন দ্বারাও লালিত। প্রগতিশীল নাথ জাতপাতকে ঘৃণা করেন এবং তিনি এই সামাজিক কুফল দূর করতে এবং দলিতদের উন্নতির জন্য সক্রিয় অংশ নেন। নাথের স্ত্রী সেবাও একজন সক্রিয় সমাজকর্মী যিনি সমাজে নারীদের উন্নয়নের জন্য কাজ করেন।

এইরকম পরিস্থিতিতে প্রতিপালিত জ্যোতি অরুণকে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করে, একটি দলিত ছেলে যাকে সে তিন মাস ধরে চেনে, নাথের সুখী পরিবার হঠাৎ ধাক্কা খায়। পরিবারটি দুটি বিপরীত দলে বিভক্ত হয়ে যায়, আদর্শবাদী-সংস্কারবাদী নাথ যিনি তার কন্যা জ্যোতিকে একজন সৈনিক হিসাবে নিয়ে এই বর্ণবাদী সমাজকে পরিবর্তন করার স্বপ্ন দেখেন। নাথের উদ্যোগ তার স্ত্রী সেবা এবং ছেলে জয়প্রকাশ বিরোধিতা করে। তারা দলিত

ছেলের সঙ্গে বিয়ের পর জ্যোতির ভবিষ্যত নিয়ে শঙ্কিত বোধ করে। আসলে নাথ, রোমান্টিক মায়ায় বাবা হিসাবে তার উদ্বেগ এবং দায়িত্বকে উপেক্ষা করে। নারী উন্নয়নে নিয়োজিত একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে সেবা খুবই বাস্তবসম্মত এবং এর জন্য তিনি তার সাংস্কৃতিক পরিধির বাইরে জ্যোতির বিয়ের তীব্র বিরোধিতা করেন। পরিবারের বারবার সতর্কতা সত্ত্বেও নাথ অরুণকে একজন মানুষ হিসেবে বর্ণনা করেছেন যে তার সম্ভাবনা রয়েছে। তার বুদ্ধিমত্তা এবং সৃজনশীলতা রয়েছে। তিনি অপরিশোধিত সোনার মতো, তাকে গলিয়ে ছাঁচে ফেলা দরকার।

অরুণকে যখন প্রথম সাক্ষাতে তার হবু শাশুড়ি সেবা তার আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, তখন শুধুমাত্র সেবার সংস্কৃতিকে আঘাত করার জন্য তাদের অবৈধ মদ-বিক্রয়ের ঐতিহ্যবাহী জীবিকা সম্পর্কে কথা বলেন। সেবা, জয়প্রকাশ এবং নাথের সাথে তার আচরণ এবং কথোপকথন অভিজাত সমাজ এবং তাদের সংস্কৃতির প্রতি তার গভীর বদ্ধমূল ঘৃণা প্রমাণ করে।

নাটকে আমরা জ্যোতিকে আর আনন্দিত, সুখী বিবাহিত মেয়েহিসেবে দেখতে পাই না; দেখতেপাই, একজন অভিজ্ঞ, বয়স্ক মহিলা হিসেবে, যিনি তার বিবাহের ভার বশ্যতার সঙ্গে বহন করেছেন। সেবা মা হিসাবে জ্যোতির পরিণতি সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে হতাশ এবং চেষ্টা করেন তার মেয়েকে অসুখী বিবাহ থেকে বেরিয়ে আসতে। সে বারবার অরুণের প্রতি জ্যোতির বশ্যতার বিরুদ্ধে ফেটে পড়ে, কিন্তু জ্যোতি তার মায়ের কাছে নতি স্বীকার করতে অস্বীকার করে। নাথ বাবাও জ্যোতির বর্তমান অবস্থা নিয়ে চিন্তিত, কিন্তু তিনি দীর্ঘকালের লালিত আদর্শকে বাদ দিতে পারেন না। একজন দায়িত্বশীল পিতার মতো তিনি জ্যোতিকে থাকার প্রস্তাব দেন, অরুণকে নিয়ে তার বাড়িতে থাকতে। শুধুমাত্র তার প্রিয় কন্যার উপর করা নির্যাতন প্রতিরোধ করার জন্য। কিন্তু জ্যোতি থাকতে অস্বীকার করে এবং অরুণকে চিরতরে ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তের পরেও, যখন অরুণ তার বাড়িতে আসে এবং তার বাবা-মায়ের সামনে নাটকীয়ভাবে ভালবাসা দেখায়, জ্যোতি অরুণের সাথে তার বাবার বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। অরুণের ভালবাসার জন্য নয়, জ্যোতি এই সিদ্ধান্ত নেয় পরিবারকে দলিত অরুণ-জ্যোতি থেকে মুক্তি দিতে। এখানেও নাথ বুঝতে ব্যর্থ হয়, নিজের মেয়েকে অজ্ঞতাবশত আনন্দিত দেখেন। নাথমনে করেন সাংস্কৃতিক বাধা ভাঙায় তার সামাজিক পরীক্ষা ব্যর্থ হবে না। এই কারণেই উচ্ছ্বসিত নাথ আনন্দে চিৎকার করে বলেন, আমি তোমাকে নিয়ে খুব গর্ববোধ করছি। আমি তোমাকে যে প্রশিক্ষণ দিয়েছি তা বৃথা যায়নি।

তারপর আমরা দেখি, নাথ অরুণ আঠাবলে রচিত আত্মজীবনীমূলক রচনাটি পড়ছেন এবং প্রশংসা করছেন। নাথের কাছে এটি জীবন্ত ভাষায় রচিত দলিত সাহিত্যের একটি ভাল নমুনা। ইতিমধ্যেই সামাজিক উন্নতির বিষয়ে নাথের উচ্চ আদর্শবাদী ধারণাগুলি ভেঙে পড়তে শুরু করে। জ্যোতির বেদনা ও যন্ত্রণা নাথকে একজন পিতা হিসাবে ব্যথিত করে। এদিকে জয়প্রকাশ পিতাকে ফিলিস্তিনি গেরিলাদের সম্পর্কে অবহিত করে। এই ইসরায়েলি যারা একসময় মার খেয়েছিল তারা এখন অন্যদের ওপর নতুন করে হামলা চালাচ্ছে। আসলে নির্যাতিত লোকেরাও মন্দ ও সহিংসতাকে পরিত্যাগ করে না। বরং তারা অন্যদের আক্রমণ করে তাদের প্রতিশোধ নিতে চায়।

একদিন অরুণ আঠালে নাথকে তার বই-উন্মোচন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাতে আসেন। তিনি যেভাবে গর্বিত ভঙ্গিতে তার শ্বশুরকে আমন্ত্রণ জানান তা অরুণের পাশবিকতার পরিচায়ক, যিনি অভিজাতদের উপর আগ্রাসন

চালাতে চান। সহানুভূতি তার ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণের জন্য। তার ভাষা ব্ল্যাকমেইলারের মতো। অরুণের আগমন নাথকে উত্তেজনাপূর্ণ করে তোলে এবং বিরক্তিতে তার সাথে চোখের যোগাযোগ এড়িয়ে যায়। অরুণের প্রস্থানের পর, নাথ ক্ষুব্ধ হন এবং তিনি অরুণের ভণ্ডামির বিরুদ্ধে ফেটে পড়েন।বইপড়ে যা সত্য বলে মনে হয়েছিল, তা চোখের সামনে মিথ্যা হয়ে যায়।

জ্যোতির মা সেবা অরুণকে বিয়ে করার জন্য সমর্থননা করলেও নীরবে সমস্ত যন্ত্রণা সহ্য করে নাথকে অরুণের বই-প্রকাশ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করার জন্য অনুরোধ করেন। একজন মা হিসেবে জ্যোতিকে একজন সুখী বিবাহিত মেয়ে হিসেবে দেখতে সেবার এই পরিবর্তন। তারই পরামর্শে নাথ অরুণের আত্মজীবনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন এবং বক্তৃতা দেন যা ফাঁপা, অলংকারমূলক আক্রোশ ছাড়া আর কিছুই নয়। নাথ তার স্ত্রী এবং ছেলের সামনে স্বীকার করে যে সে যা করেছে, শুধুমাত্র তার মেয়ের জীবন বাঁচানোর জন্য করেছে। সে ভালো করেই জানে, এই ধরনের ভণ্ডামি একজন সুবিধাবাদীকে চিহ্নিত করে। সেই বইটি কোন আত্মজীবনী নয়; এটি অর্ধেক সত্যের উপর ভিত্তি করে রচিত। নাথ প্রচন্ড মানসিক দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়ে যান এবং পুত্রকে তার আদর্শ অনুসরণ না করার জন্য সতর্ক করেন।

তারপর আমরা নাটকে দেখি, জ্যোতি তার বাবার কাছে ভণ্ডামিপূর্ণ বক্তৃতা দেওয়ার জন্য সরাসরি উত্তর দাবি করে। সে তার বাবাকে বাস্তবতার মুখোমুখি করে। জ্যোতি তার বাবাকেও ভণ্ড হিসেবে অভিযুক্ত করে এবং তাকে তার ভণ্ড দলিত স্বামী অরুণের মতো একই লাইনে নিয়ে আসে। শেষে জ্যোতি বাবার ভুল দর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে এবং জীবনকে মেনে নিয়ে দলিত স্বামীর কাছে ফিরে যায়।

চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা

একক- ৫

হাইমোন নাট্যচরিত্র হ্যামলেট ও মহম্মদের সঙ্গে তুলনা

১) হাইমোন, হ্যামলেট ও মহম্মদের সঙ্গে তুলনা

'আন্তিগোনে' নাটকে আন্তিগোনের প্রেমিক হাইমোন হলো ক্রেয়নের পুত্র। হাইমোনের ভুমিকা নাটকের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অত্যাচারী পিতা ক্রেয়নের বিরুদ্ধে পুত্র হাইমোনের প্রতিবাদ আমাদের বিশেষভাবে অনুপ্রানিত করে। এই প্রতিবাদের স্বর বিভিন্ন ভাষায় রচিত নাটকের মধ্যেও পিতা ও পুত্রের দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। শুধুমাত্র গ্রীক নাটক ''আন্তিগোনে' নয় ইংরাজী নাটক, ফরাসী নাটক, মারাঠী নাটক, বাংলা নাটকের মধ্যেও বিভিন্ন সময়ে পিতা-পুত্র, পিতা-কন্যার দ্বন্দ্ব এবং প্রতিবাদ লক্ষ্য করা যায়। রাজা ক্রেয়ন, আন্তিগোনের উপর নির্দেশ চাপিয়ে দিলে এবং শাস্তির বিধান করলে ক্রেয়নের ঘোষিত শাস্তির বিরুদ্ধে আন্তিগোনে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সে মনে করে পৃথিবীতে আমরা কেউই অমর নই। আন্তিগোনে সমস্ত ভয়-ভীতি এবং শাস্তি উপেক্ষা করে বলেন —

''আমি জানি আমি তো অমর নই
তোমার নিষেধ ঘোষিত না-হলেও
আমি মরতাম
আজ যদি মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়
তবে তাই হোক।''

আন্তিগোনে ভাইয়ের সমাধিস্থ করতে পেরে সে গর্ববোধ অনুভব করে। সম্রাট ক্রেয়নের বিরুদ্ধে চোখে চোখ রেখে একজন নারীর প্রবল প্রতিবাদ সত্তার প্রকাশ এই নাটকের মধ্যে পরিলক্ষিত করা যায়। সম্রাটকে সদর্পে আন্তিগোনে বলেন- 'বাক্যের, কর্মের স্বাধীনতা শুধু সম্রাটের। সম্রাট সৌভাগ্যবান।'' ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করতেও ছাড়েননি আন্তিগোনে সম্রাট ক্রেয়নকে। সম্রাট ক্রেয়ন মনে করেন —

''অন্তঃপুরই মেয়েদের যথাযোগ্য স্থান।
আর লক্ষ্য রেখো
অনেক সাহসী লোকও মৃত্যু কাছাকাছি এলে
পালাবার পথ খোঁজে।''

স্বৈরাচারী শাসক ক্রেয়নের বিরুদ্ধে তার পুত্র হাইমোনও পিতার দুর্বলতার জায়গাগুলি চিহ্নিত করে সংশোধন করার অনুরোধ জানায়। হাইমোন একাধিকবার দূরদর্শী চিন্তাধারার মাধ্যমে পিতা সম্রাট ক্রেয়নকে বোঝাবার চেষ্টা

করে। ক্রেয়ন নিজের পুত্র হাইমোনকে নির্বোধ, মেয়ের আঁচলে বাধা পড়ে আছো, এই সমস্ত কথা বলেন। হাইমোন স্বৈরাচারী পিতার বিরুদ্ধে গিয়ে বলেন —

"আপনিও আমাকে আর
কখনো দেখবেন না।
যারা আপনার অধর্মের
আপনার অন্যায়ের সঙ্গী হতে চায়
সাক্ষী হতে চায়, তারা থাক
আমি থাকব না।"

'আন্তিগোনে' নাটকের মধ্যে আমরা দেখতে পাই একাধিক জায়গায় আত্মগর্বী স্বৈরাচারী সম্রাট ক্রেয়নের বিরুদ্ধে বিভিন্ন চরিত্র প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে। শেক্সপীয়রের হ্যামলেট চরিত্রের সঙ্গে আন্তিগোনের হাইমোন চরিত্রের কিছুটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডির বৈশিষ্ট্য হলো দোলাচল এবং সংকট। ডেনমার্কের যুবরাজ হ্যামলেট দেশের বাইরে থাকাকালীন তার পিতাকে তার কাকা ষড়যন্ত্র করে মেরে ফেলেন এবং তারপর কাকা সিংহাসনে বসেন এবং তার মাকে বিবাহ করেন। হ্যামলেট দেশে ফিরে এসে পিতার আত্মার সঙ্গে কথোপকথনে সব কিছু জানতে পারে। এই পরিবেশে ডেনমার্কের যুবরাজের কি করা উচিত, সে কি কাকাকে হত্যা করে, তার পিতার বিরুদ্ধে অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবে এই অন্তর্দন্দ্বে সে লিপ্ত হতে থাকে। পরিশেষে কাকাকে হত্যা করে এবং নিজেও মারা যান। To be এবং Not to be কোনটা আসল এই দ্বন্দ্ব তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। হ্যামলেট যেমন সক্রিয় Active চরিত্র, হাইমোন তা নয় আন্তিগোনেকে প্রাধান্য দিতে হবে বলে হাইমোন চরিত্র অনেকটা Flat হয়ে গেছে।

'আন্তিগোনে' শেক্সপীয়রের ১৯০০ বছর আগে লেখা। সেই সময় নাট্যকারের প্রতিবাদী মানসিকতা হাইমোন চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। হাইমোন চরিত্রের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখা 'সাজাহান' নাটকের ঔরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। মহম্মদ পিতা ঔরঙ্গজেবকে তার ভুল দায়িত্ব, কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করেছেন। হাইমোনও তার পিতা ক্রেয়নকে তার অত্যাচারের বিরুদ্ধে অথবা আন্তিগোনের বিরুদ্ধে অন্যায়ের জন্য প্রতিবাদে লিপ্ত হয়েছে। হাইমোন তার পিতা ক্রেয়নকে বলেছেন—

'সন্তান হিসেবে আমার কর্তব্য হলো লোকে আপনার সম্বন্ধে যা বলে, ভাবে,
আপনার বিরুদ্ধে যা করে তার খোঁজ রাখা'

ক্রেয়ন অত্যাচারী শাসকের মতো তখন বলে উঠেছেন — 'আমাকে এখন জ্ঞান নিতে হবে দাড়ি গোঁফ না-ওঠা একটা ছোকরার কাছে।' হাইমোন ক্রেয়নের বিরুদ্ধে বলেছে

"যে রাস্ট্র রাজারই শুধু সে রাষ্ট্র কি রাষ্ট্র?"

এখানেই হাইমোন চরিত্র প্রবল প্রতিবাদী চরিত্র হতে পারেনি। নাটকের শেষে দেখা যায় হাইমোন নিজের তরবারি দ্বারা পিতা ক্রেয়নকে মারতে গেলে সরে দাঁড়ালে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় হাইমোন তখন তরবারি নিজের শরীরে

ঢুকিয়ে দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। এইখানেই ট্র্যাজেডির বীজ যে কতটা গভীরে প্রবেশ করেছে তা বোঝা যায়। হাইমোনও উচ্চআদর্শ ও নৈতিকতার কথা বলেছে। 'আন্তিগোনে' নাটকে হাইমোন সক্রিয় চরিত্র নাহলেও প্রতিবাদী ও নৈতিকতা, এবং উচ্চন্যায়বোধের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পৃথিবী খ্যাত নাট্যকার শেক্সপিয়ারের বিখ্যাত ট্রাজেডি নাটক ''হ্যামলেট'। 'হ্যামলেট' নাটকেও সম্রাট ক্লডিয়াস তার বিরুদ্ধে ও হ্যামলেট প্রতিবাদ করেছে। এই নাটকের মধ্যে হ্যামলেট শুধুমাত্র প্রেতাত্মার কথায় অন্ধের মত বিশ্বাস করেনি, প্রমাণস্বরূপ ভ্রাম্যমান নাট্যদলের অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে ক্লডিয়াসের গুঢ় চক্রান্ত হ্যামলেটের কাছে ধরা পড়েছে। 'হ্যামলেট' নাটকের মধ্যে হ্যামলেটকে নানাভাবে ক্লডিয়াস পিতার মৃত্যুর শোক থেকে ভুলিয়ে রাখতে নানা কৌশল অবলম্বন করেন। ক্লডিয়াস নানাভাবে হ্যামলেটকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করলেও তার সমস্ত ষড়যন্ত্র হ্যামলেট বুঝতে পারে।

২) ক্রেয়োন ও আন্তিগোনে চরিত্রের আলোচনা

'আন্তিগোনে' নাটকে আন্তিগোনের ভুমিকাকে নানাভাবে দেখানোর জন্য ক্রেয়নের প্রয়োজন ছিল। ক্রেয়ন এই নাটকে মূলনায়ক, তাই বলা যায় নাটকে ক্রেয়ন ও আন্তিগোনের সম্পর্ক বিদ্যমান।

ক্রেয়ন সবসময় প্রতিহিংসার মানসিকতা নিয়ে চলেছে। আন্তিগোনে ক্রেয়নকে তাই ঘৃণা করেছে। সে ক্রেয়নের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে। ইয়েসমিনের সাহায্য না পেয়েও আন্তিগোনে একাই লড়াই করেছে। ক্রেয়ন রাষ্ট্রের পক্ষে, আর আন্তিগোনে মানবসমাজের অলিখিত নিয়ম ও মানবিকতার পক্ষে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করেছে, তাই রাষ্ট্রের প্রতিনিধি ক্রেয়ন তাকে দন্ড দিয়েছে। দুজনেই নীতিকে দেখেছেন আংশিক দৃষ্টিতে তাই দু'জনেরই মৃত্যু ঘটেছে।

ক্রেয়ন ও আন্তিগোনেকে সচেতন ভাবেই পরস্পরের বিরোধী করে গড়ে তুলেছেন নাট্যকার। চরিত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব একজন পুরুষ ও একজন নারী। ক্রেয়ন বারবার বলেছেন, সে নারীর কাছে হার মানতে চায় না, মেয়েদের স্থান অন্তঃপুরে, রাষ্ট্র কক্ষে নয়। ইসমেনেও একবার আন্তিগোনেকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে— 'পুরুষের সঙ্গে যুদ্ধ আমাদের কাজ নয়।'

ক্রেয়নের আনুগত্য রাস্ট্র, আন্তিগোনের আনুগত্য পরিবার, রক্তবন্ধনের প্রতি। একজনের ভুমিকা শাসকের, অন্যজনের ভূমিকা শাসিতের। একজনের প্রধান অস্ত্র রাষ্ট্রশক্তি, নিয়ম, অন্যের আত্মবিশ্বাস, ধর্ম। ক্রেয়ন মনে করেন আন্তিগোনে হঠকারী, উগ্র এবং আন্তিগোনে মনে করে ক্রেয়ন স্বেচ্ছাচারী, হিংস্র, দুজনেরই পরিণতি দুঃখে, মৃত্যুতে। ক্রেয়ন শুধু অগণতান্ত্রিক নন, তিনি কোনরকম স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নন। স্বেচ্ছাচারী ক্রেয়ন বাক্যের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নয়। তিনি একজন অসহিষ্ণু ব্যক্তি। ক্রেয়নের সঙ্গে 'সাজাহান' নাটকের ঔরঙ্গজেব চরিত্রের মিল লক্ষ্য করা যায়। তারা উভয়েই দাম্ভিক, অহংকারী ও হৃদয়হীন।

অন্যদিকে আন্তিগোনের প্রতি ধাবিত হয় আমাদের সহিষ্ণুতা এবং শ্রদ্ধাবোধ। আন্তিগোনের পথ পবিত্র কর্তব্যবোধের যা তার চরিত্রের মহত্ত্বকে প্রকাশ করেছে। ক্রেয়ন আন্তিগোনেকে দেখেছেন তার ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে। 'আন্তিগোনে' নাটকে ক্রেয়নের সিদ্ধান্তের বিরোধী রূপে আন্তিগোনে দর্শকহৃদয়ে স্থান করে নেয়। ক্রেয়ন বারবার বলেছেন তিনি নারীর কাছে পরাজয় স্বীকার করবেন না। আন্তিগোনে ক্রেয়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে,

তার কারণ ক্রেয়ন রক্তবন্ধনের গুরুত্বকে অস্বীকার করেছে। আন্তিগোনের সংগ্রাম ব্যক্তিগত কর্তব্যবোধের, তার কাছে আদর্শ, নীতি বা ধর্ম প্রধান নয়।

প্রহরীর চোখ দিয়ে দেখলে দেখাযায় আন্তিগোনে চরিত্রের এক গভীর শক্তির উৎস। আন্তিগোনের জন্য নাটকের মধ্যে সমবেদনা প্রকাশ করেছেন নাট্যকার। আন্তিগোনের কাজের সমর্থন এসেছে প্রথমে প্রহরীর কাছ থেকে। সোফোক্লেসের নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র শুধু আন্তিগোনে নয়, নাটক শেষ হয়েছে শুধু আন্তিগোনের মৃত্যুতে নয়, ক্রেয়নের বিপর্যয়ে। ক্রেয়নকে নাট্যকার রেখেছেন নাটকের কেন্দ্রে, আন্তিগোনেকে সৃষ্টি করেছেন ক্রেয়নের পতনকে গভীর এবং সর্বগ্রাসী করে তোলার জন্য। তাই বলা যায় ক্রেয়ন ও আন্তিগোনেকে সচেতনভাবেই নাট্যকার পরস্পর বিরোধী ভাবে চিত্রিত করেছেন।

৩) সারাবিশ্বে অত্যাচারী শাসক হিসাবে ক্রেয়ন, ক্লডিয়াস, ঔরঙ্গজেব, অঘোর ঘোষ চরিত্র

যে কোন নাটকের ক্ষেত্রেই অন্যতম হলো ট্র্যাজেডি। প্রাচীন গ্রিসে এর উদ্ভব ও গৌরবময় সমৃদ্ধি। এই ট্র্যজেডি রচয়িতাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচয়িতা সোফোক্লেস। তিনি প্রায় একশত নাটক রচনা করেন। এই নাটক গুলির মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় নাটক 'আন্তিগোনে'। এখানে রাজা ওইদিপৌসের কন্যা আন্তিগোনে ও তার প্রতিপক্ষ ক্রেয়োনের ট্র্যাজিক কাহিনী উপস্থাপিত হয়েছে। নাটকটিতে ক্রেয়োনের ভূমিকা মূলনায়ক রূপে এবং অত্যাচারী এক শাসক রূপে।

সারাবিশ্বে অত্যাচারী শাসক রূপে হিটলার, মুসোলিনি এবং নেপোলিয়ন বিশেষভাবে পরিচিত। তাছাড়া দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখা 'সাজাহান' নাটকের ঔরঙ্গজেবেকে এক অত্যাচারী শাসক রূপে নাটকে উপস্থাপিত করেছেন নাট্যকার। এই অত্যাচারী শাসকগণের সঙ্গে ক্রেয়োন চরিত্রের কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। হিটলার, মুসোলিনি, নেপোলিয়ন, ঔরঙ্গজেব সকলেই অত্যাচারি তাই প্রত্যেকেরই পতন ঘটেছে। নাটকে দেখা যায় ক্রেয়োনের চরম বিপর্যয়। ক্রেয়োন নাটকে সবসময় অত্যাচারী প্রতিশোধের মানসিকতা নিয়ে চলেছে। পৃথিবীর যত গ্লানি, কলুষতাকে ক্রেয়োন বহন করে চলেছে। আন্তিগোনের প্রতি ক্রেয়োন যে অন্যায় করেছে, তার প্রেক্ষিতে তার পুত্র হাইমোনের সঙ্গে কথোপকথনে ক্রেয়োন চরিত্র উঠে এসেছে। ক্রেয়োনের চরিত্রে লোভ, অন্যায়, রক্তের উচ্ছ্বাসের চিত্র ঘোষিত হয়ে থাকে ফলে সাধারণ মানুষ ক্রেয়নকে মেনে নিতে পারে না।

ক্রেয়োনের অর্থ শাসক। সে বারবার বলেছে নারীর কাছে সে নতি স্বীকার করবেন না। তার কথায় মেয়েদের স্থান অন্তঃপুরে, রাষ্ট্রকক্ষে নয়। এই ক্রেয়োন পুরুষের সম্বন্ধে যে পরিমান সচেতন নারীর কর্মক্ষেত্রের সংকীর্ণতা সম্বন্ধে ও সেই পরিমানে কৃত নিশ্চয়। তার কাছে বড় রাষ্ট্রের নিয়ম, প্রধান অস্ত্র রাষ্ট্রশক্তি। তা তার কথাতেই পরিস্কার

'আমি মনে করি রাষ্ট্র আমাদের যথার্থ আশ্রয়
রাষ্ট্র আমাদের নিরাপত্তা
রাষ্ট্রের কল্যাণই আমাদের কল্যাণ
রাষ্ট্র আমাদের বন্ধু।'

সেই নির্দেশ দিয়েছে ওইদিপৌসের পুত্র পোলুনেইকেসের মৃতদেহ সমাধি করা হবে না। কেননা সে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গিয়েছিল। ধ্বংস করতে চেয়েছিল পিতৃপুরুষের পবিত্র নগরী। তাই তার দেহ হবে শকুন ও কুকুরের খাদ্য। আর অন্য ভাই এতইক্লেস পাবে জীবনে মরণে সকলের শ্রদ্ধা, একথা সে সকলকে জানিয়ে দিয়েছে। এই নিয়ম কার্যকরী করতেও ক্রেয়ন বদ্ধপরিকর।

কিন্তু পলুনেইকেসের মৃতদেহকে সমাধিস্থ করেছে কেউ এই খবর যে প্রহরী ক্রেয়োনকে দিতে এসেছে তাকে ক্রেয়োন সতর্ক করে বলেছে—

"..এই কাজ যে করেছে তাকে এখানে না যদি আনো তোমাকে শেখাবো
কুপথে অর্জিত যত অর্থের মূল্য কী?"

ক্রেয়োন যা বক্তব্য পোষণ করে সবই রাষ্ট্রের জন্য। রাষ্ট্রের জন্য মঙ্গলময় কর্ম করাই তার জীবনের একমাত্র কর্ম। একথা তার পুত্র হাইমোনকেও বলেছে—

"আমার বক্তব্য কিন্তু রাষ্ট্রের স্বপক্ষে, রাজার স্বপক্ষে"

এই রাষ্ট্রের জন্যই ক্রেয়োন থীবেসের অন্ধ ভবিষ্যৎ বক্তা তেইরেসিয়াসের কথাতে ক্রুদ্ধ হয়েছে। তেইরেসিয়াসের ভবিষ্যতের কথা শুনে ক্রেয়োন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। সে কোরাস দলের কাছে পরামর্শ চেয়েছে এবং তাদের কথামতো শেষ পর্যন্ত নিজের নির্দেশ পরিবর্তন করেছে। সে বলেছে—

"আমার আদেশ ছিল মৃত্যুর আমি দিচ্ছি মুক্তির আদেশ"

কিন্তু ক্রেয়োনের এই সত্যের রূপ বুঝতে অনেক দেরি হয়ে গেছে। এর মধ্যেই সে দেখেছে পুত্র হাইমোনের মৃতদেহ। পরবর্তী কিছুক্ষণের মধ্যেই সে শুনেছে স্ত্রী রানী এউরুদিকের মৃত্যু। এই সময় ক্রেয়োন তার সকল অপরাধ স্বীকার করেছে। সে উপলব্ধি করেছে— 'আমি একটা নিষ্ফল শুন্য'

এ সময় ক্রেয়োন নিজ কর্মে অনুতপ্ত। নাটকের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সক্রিয় চরিত্র ক্রেয়োন। সে অধর্মাচারী, ব্যর্থ স্বামী এবং ব্যর্থ পিতার পরিচয় বহন করে বিধাতার শেষ দ্বন্দ্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে। তাই অত্যাচারীদের মত ক্রেয়োনের পতন অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

৪) আমাদের পাঠ্য (আন্তিগোনে, হ্যামলেট, কন্যাদান, চাকভাঙা মধু) নাটকগুলিতে ট্র্যাজেডি

দৈব বা অদৃষ্টের অনিবার্যতায় পীড়িত, গভীর অন্তর্দন্দ্ব ও বহির্দন্দ্বে পরাভূত অথচ নায়কোচিত আত্মপ্রতিষ্ঠার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে মহিমময় মানবজীবনের করুন রসাত্মক কাহিনীই সাধারণভাবে ট্র্যাজেডি রূপে পরিচিত। দেবতা কিংবা পুরাণকথিত বীরদের কীর্তিকলাপ, দুঃখ, যন্ত্রণা, সংঘাত, বিনাশকে উপজীব্য করে প্রাচীন গ্রিসে উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠিত ঘটেছিল এই বিষাদাত্মক নাট্যরূপের। এই করুণ রসাত্মক নাট্যরূপের এক সতর্ক নীরক্ত অথচ রসজ্ঞ বিশ্লেষণ পাওয়া গেল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দে রচিত অ্যারিস্টোটলের 'দি পোয়েটিকস' গ্রন্থে। এক সংযত ও প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ সংজ্ঞায় তিনি ট্র্যাজেডির স্বরূপ ও লক্ষণ সমূহ চিহ্নিত করেছেন এ গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়—

"Tregedy, then, is an imitation of an action that is serious and complete in itself, having certain magnitude, not in a narrative from but in action, with pleasurable accessries, arousing pity and fear and here with it accomplishes to cathersis."

আমরা ট্র্যাজেডির বিভিন্ন সংজ্ঞাগত দিক থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর ট্র্যাজেডির কথা জানতে পারি। সে যাই হোক আমরা এখন দেখব আমাদের পাঠ্য নাটকগুলি সত্যিই ট্র্যাজেডি নাটক হয়ে উঠেছে কিনা এবং তা কোন ধরনের ট্র্যাজেডি।

আন্তিগোনে : আন্তিগোনে নাটকটি রচিত হয়েছে গ্রিক নাট্যকার সোফোক্লেসের হাতে। তিনি প্রায় একশত নাটক রচনা করেছেন। তারমধ্যে যে কয়েকটি নাটকের কথা জানতে পারি সেগুলি বেশিরভাগই ট্র্যাজেডি নাটক। ট্র্যাজেডি সৃষ্টির আঙ্গিকগত কলাকৌশলে তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। তার সংলাপ পরিমিত ও অতিসূক্ষ ভারবহ। তর্কে, যুক্তিতে, বিবৃতি তার দক্ষতা অসাধারণ। রাজা ঔইদিপৌসের কন্যা ও তার প্রতিপক্ষ ক্রেয়োনের ট্র্যাজিক কাহিনীই উপস্থাপিত হয়েছে আন্তিগোনে নাটকে। এখানে গ্রিক নাটকের বৈশিষ্ট্য অনুসারে নিয়তি ঔইদিপৌসের অভিশাপ দ্বারা প্রভাব ফেলেছে তার সন্তানদের উপর। ওইদিপৌসের দুই ছেলের মধ্যে ছোট ছেলে পলুনেইকেস বাইরের রাজাদের সাহায্য নিয়ে থিবেস আক্রমণ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি শোচনীয়ভাবে মৃত্যুবরণ করেন। অন্যদিকে আমরা দেখি রাজা ক্রেয়োন পলুনেইকেসের শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে দিতে চাইলেন না। কিন্তু আন্তিগোনে দৈব বিধান রক্ষা করার জন্য এবং ভ্রাতার প্রতি ভালোবাসায় সে কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করে প্রাণদন্ডে দন্ডিত হলেন। ক্রেয়োনের পুত্র হাইমোনের গভীর আকর্ষণ ছিল আন্তিগোনের উপর। প্রণয়িনীর মুক্তি প্রার্থনা করে নিজেকে ব্যর্থ মনে করে আন্তিগোনে মারা গেলে তিনিও দেহত্যাগ করেন। ক্রেয়োনের স্ত্রীও মারা যান। বেঁচে থাকেন শুধু ক্রেয়োন। তার হৃদয় যন্ত্রনা আমরাও অনুভব করি। অর্থাৎ নাটকটি শেষ পর্যন্ত আগাগোড়া ট্র্যাজিক রসেই পূর্ণ।

হ্যামলেট : বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ও চিরকালের চিরনূতন নাট্যকার শেক্সপীয়র রচিত 'হ্যামলেট' একটি সার্থক ট্র্যাজেডি নাটক। হ্যামলেটের জীবনে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রতিহিংসাবৃত্তি ও প্রেমের সঙ্গে নৈতিক দ্বিধার কারণেই নাটকটি একটি ট্র্যাজিক নাটক হয়ে উঠেছে। শেক্সপীয়রের প্রতিটি নাটকের মধ্যে বাইরের ও ভেতরের ট্র্যাজেডি আছে। বাইরের ঘটনা কখনো ভিতরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত-কখনো তা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছেখুন, হত্যা ও রক্তপাতের মধ্য দিয়ে, কিন্তু ভিতরের ট্রাজেডি শান্ত ও গভীর। বুদ্ধির সঙ্গে অনুভূতির অথবা চরিত্রের. বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অনুভূতির দ্বন্দ্বে অপরূপ। শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডির আরও দুটি বৈশিষ্ট্য—

অলৌকিক শক্তির প্রচ্ছন্ন ক্রিয়া

পরিবেশের সঙ্গে নায়কের একটা বিশেষ সম্পর্ক এখানে বর্তমান। শেক্সপীয়রের নায়কেরা এমন একটি পরিবেশের মধ্যে দণ্ডায়মান যে একাকি ভাগ্যের সঙ্গে তারা সংগ্রাম করতে পারছে না। ধার্মিক ও প্রেমিক হ্যামলেটও জগৎটাকে নিজের মত করে নিতে ব্যর্থ হয়। তাই হ্যামলেট নাটকটিতে আমরা এক ট্র্যাজিক ভাবই লক্ষ্য করি।

আমাদের পাঠ্য এই দুটি নাটক পাশ্চাত্যের ট্র্যাজেডি শ্রেণীকরণে স্বতন্ত্র। এখন বাকি দুটি নাটক 'কন্যাদান' ও 'চাকভাঙা মধু' এই দুটি নাটক একটু অন্য স্বতন্ত্রতায় লক্ষ্য করবো। কারণ যারা এই নাটকগুলি রচনা করেছেন পরিবেশগত ও মানসিক কারণে ট্র্যাজিডির স্বরূপ হয়তো ফুটিয়ে তুলেছেন তবে তা একটু অন্যভাবে। তাই হয়তো

কোন বিশেষ স্বতন্ত্র ট্র্যাজিক নামে এদের নামকরণ করা যায়না। সাধারণত আমরা যে ট্র্যাজেডিগুলি বিদেশী সাহিত্যে পাই সেখানে বাংলা ট্র্যাজেডিও তাদের কিছুটা স্বতন্ত্রতা লাভ করেছেন। যেমন—

ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি

সামাজিক বা পারিবারিক ট্র্যাজেডি

পৌরাণিক ট্র্যাজেডি

সমস্যামূলক আধুনিক ট্র্যাজেডি

এই ট্র্যাজেডিগুলির বৈশিষ্ট্যের আলোকেই বাকি দুটি নাটককে আমরা বিচার করব।

কন্যাদান : 'কন্যাদান' নাটকে আমরা দেখি এক আদর্শ পিতাকে সামনে রেখে একটি মেয়ের এগিয়ে যাওয়ার কাহিনী। কিন্তু সেই আদর্শ চরিত্র শেষ পর্যন্ত একটি মেকি মুখোশে ঢাকা চরিত্র বলেই আবিষ্কার করে মেয়েটি আর তখনই নেমে আসে এক ট্র্যাজিক মানবতার চিত্র। একদিন নিজেকে আদর্শবাদী চরিত্র হিসেবে জাহির করার জন্য একজন জনদরদী নেতা সেজে এক উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের ছেলের সঙ্গেই বিয়ে দেন জ্যোতির বাবা নাথ দেওলেকার মহাশয়। কিন্তু একদিন দেখা যায় মেয়ের সংসার বাচাতে জামাইয়ের নামে মিথ্যা স্তুতি বাক্য বক্তৃতা হিসাবে সবার সামনে তুলে ধরেন, তখনই জ্যোতির মন আঘাতে জর্জরিত হয়ে ওঠে। যে পিতা আদর্শ রক্ষা করার কথা সন্তানদের শিখিয়েছে সেই-ই আজ মিথ্যায় নিজেকে জড়িয়ে তুলছে এটা সে কোন ভাবেই মানতে পারছে না এই নাটকে ট্র্যাজেডি হয়ে উঠেছে।

চাকভাঙা মধু : একটি মেয়ে সংসার সুখে বঞ্চিত তবুও ভাগ্যবস্তু হিসাবে নিস্তার নেই। যে জমিদার অত্যাচারী সেটা জেনেও তাকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা সে করেছে তবু সে বেঁচে উঠেই ভোগ করতে চেয়েছে সেই মেয়েকেই। একটি মেয়ে হয়ে যখন নিজেকে বাঁচানোর একটা উপায় ছিল সেটাও ব্যর্থ হলে তার নারীসত্তা প্রবল পরাক্রমে জেগে ওঠে। তাই কেউ জমিদারের সামনে যেতে সাহস না পেলেও সেই তাকে প্রাণে মেরে শেষ করে। নারীর এই চিত্র আমাদের সমাজের বুকে ট্র্যাজিক চিত্রেরই একটি প্রতিরূপ। আর এই নাটকটির সার্থকতা সেইখানেই।

৫) 'আন্তিগোনে' নাটকে কেন্দ্রীয় চরিত্র ক্রেয়োন

নাট্যসাহিত্যের শাখাগুলির মধ্যে একটি অন্যতম শাখা ট্র্যাজেডি। প্রাচীন গ্রিসে এর উদ্ভব ও গৌরবময় সমৃদ্ধি। এই ট্র্যাজেডি রচয়িতাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচয়িতা সোফোক্লেস। তিনি প্রায় একশত নাটক রচনা করেন। এই নাটক গুলির মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় নাটক 'আন্তিগোনে'। এখানে রাজা ওইদিপৌসের কন্যা আন্তিগোনে ও তার প্রতিপক্ষ ক্রেয়োনের ট্র্যাজিক কাহিনী উপস্থাপিত হয়েছে। নাটকটি শেষ হয়েছে আন্তিগোনের মৃত্যুতে নয়, ক্রেয়োনের বিপর্যয়ে। এই ক্রেয়োন নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র। এবার আমরা তার চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করব।

ক্রেয়োনের অর্থ শাসক। সে বারবার বলেছে নারীর কাছে সে নতি স্বীকার করতে চান না। তার কথায় মেয়েদের স্থান অন্তঃপুরে, রাষ্ট্রকক্ষে নয়। এই ক্রেয়োন পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে যে পরিমাণ সচেতন নারীর কর্মক্ষেত্রের সংকীর্ণতা সম্বন্ধেও সেই পরিমাণে কৃত নিশ্চয়। তার কাছে বড় রাষ্ট্রের নিয়ম, প্রধান অস্ত্র রাষ্ট্রশক্তি তা তার কথাতেই পরিস্কার —

"আমি যদি দেখি প্রজাদের সামনে বিপদ
আমি চুপ করে থাকব না
দেশের শত্রুকে আমি কোনদিন
বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে পারবো না
আমি মনে করি রাষ্ট্র আমাদের যথার্থ আশ্রয়
রাষ্ট্র আমাদের নিরাপত্তা
রাষ্ট্রের কল্যাণ আমাদের কল্যাণ
রাষ্ট্র আমাদের বন্ধু"

সেই নির্দেশ দিয়েছে ওইদিপৌসের পুত্র পলুনেইকেসের মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হবে না। কেননা সে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গিয়েছিল, ধ্বংস করতে চেয়েছিল পিতৃ-পুরুষের পবিত্র নগরী থীবেসকে। তাই তার দেহ হবে শকুন কুকুরের খাদ্য। অন্য ভাই এতইক্লেস পাবে জীবনে মরণে সকলের শ্রদ্ধা এবং সম্মান। একথা সে সকলকে জানিয়ে দিয়েছে। এমনকি এই নির্দেশ কার্যকরী করতেও সে বদ্ধপরিকর।

ক্রেয়োন পলুনেইকেসের মৃতদেহ যে গোপনে সমাধিস্থ করেছে তাকেও খুঁজে বার করার জন্য বদ্ধপরিকর। এ সময় যখন কোরাসনায়ক বলেছেন 'এ কাজটা দেবতারা করেনি তো?' একথা শুনে ক্রেয়ন ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছে —

"দেবতারা এসে
পথে পড়ে থাকা মড়া সৎকার করবেন!
বোধকরি তাকে খুব ভক্ত মনে করে
পুরস্কার দিতে চান! কাকে? না যে লোক
তাদের মন্দির ধ্বংস করতে চেয়েছিল,
দেবতার পুণ্যপাঠ ধ্বংস করেছিল
ভস্ম করে দিতে এসেছিল শস্য ক্ষেত্র
তাদের বিধান সব ভেঙেচুরে ছিড়ে
ফেলে দিতে এসেছিল, সেই-সেই লোক
তোমরা সব মনে করো দেবতার প্রিয়?"

প্রহরী যখন তাকে এই সমাধিস্থ করার খবর দিতে এসেছে তাকে ক্রেয়োন সতর্ক করে দিয়েছে —

"এ কাজ যে করেছে তাকে
এখানে না যদি আনো, তোমাকে শেখাবো
কুপথে অর্জিত যত অর্থের মূল্য কী

তার একমাত্র মূল্য,

জেনে রেখো, মৃত্যু"

এরপর প্রহরী তার সামনে পলুনেইকেসের শবদেহ সমাধিস্থ করা আন্তিগোনেকে ধরে এনেছে। এসময় আন্তিগোনে বলেছে —

"আমার সিদ্ধান্ত নির্বুদ্ধিতা

তার জন্য দণ্ডদান নির্বোধের কাজ হবে"

তার উত্তর দেওয়ার সময় ক্রেয়োন সেই রাষ্ট্রকেই তার ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে বলেছে—

"যদি কেউ এমন ভাবে রাষ্ট্রের আদেশ

অমান্য করেও দণ্ডিত না হয়

তাহলে বলতে হবে এই মেয়েটিই পুরুষ

আর আমি একটা স্ত্রীলোক

আমার বোনের মেয়ে হোক

বা আমার আর কোন নিকটাত্মীয় হোক

দন্ড তাকে পেতে হবে

তাকে এবং তার বোনকেও

সেও এই ষড়যন্ত্রে অংশভাগী

দুজনেই সমান দোষী।"

তার কাছে রাষ্ট্র বড়। রাষ্ট্রের জন্য মঙ্গলময় কর্ম করাই তার জীবনের একমাত্র ধর্ম। একথা সে তার পুত্র হাইমোনকেও বলেছে—

"আমার বক্তব্য কিন্তু রাষ্ট্রের স্বপক্ষে, রাজার স্বপক্ষে"

এমনকি এ রাষ্ট্রের জন্যই ক্রেয়োন থীবেসের অন্ধ ভবিষ্যৎ বক্তা তেইরেসিয়াসের কথাতে ক্রুদ্ধ হয়েছে। তেইরেসিয়াস যখন বলেছেন

"মৃতকে সম্মান করো

নিহতকে আবার নিহত করে

কি গৌরব?

মৃতকে আঘাত করে কার লাভ?"

তখন ক্রেয়ন বলেছে

"দেবতাকে অপবিত্র করার ক্ষমতা
কোন মানুষেরই নেই, এইটুকু আমি
বেশ ভালো করে জানি, তেইরেশিয়াস,
তুমি বয়সে প্রবীণ, তুমি শুনে রাখ
তোমাদের মত অতি সুচতুর লোক
ধান্দা চালাবার জন্য ধর্মের আড়ালে
পচামাল লুকিয়ে রেখেছ, তোমাদের
পরিণাম বলে দিচ্ছি, অতি ভয়াবহ।"

এসময় তেইরেসিয়াসকে ক্রেয়োনের অর্থলোভী বলে মনে হয়েছে। কিন্তু তেইরেসিয়াস যখন ক্রুদ্ধ হয়ে ভবিষ্যতের কথা বলেছে, তখন ক্রেয়োন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। সে কোরাস দলের কাছে পরামর্শ চেয়েছে। এবং তাদের কথামতো শেষ পর্যন্ত নিজের নির্দেশ পরিবর্তন করেছে। ক্রেয়োন বলেছে—

"আমার আদেশ ছিল মৃত্যুর
আমি দিচ্ছি মুক্তির আদেশ
এখন বুঝেছি
স্বর্গের আদেশ মানা
শ্রেয়।"

কিন্তু ক্রেয়োনের এই সত্যের রূপ বুঝতে অনেক দেরি হয়ে গেছে। এর মধ্যেই সে দেখেছে পুত্র হাইমনের মৃতদেহ। তখন সে কোরাস দলকে দেখিয়ে বলেছে—

"দ্যাখো দ্যাখো ভয়ঙ্কর এ হঠকারিতা
হত আর হত্যাকারী, পুত্র আর পিতা।
মৃত, মৃত আমার সন্তান
এখনো শরীরে তার যৌবন অম্লান।
না, না কোনো দোষ নেই তাঁর
সমস্ত আমার দোষ, এ পাপ আমার।"

তারপরে সে শুনেছে স্ত্রী রাণী এউরুদিকের মৃত্যু। এসময় সে সকলকে তার এই দুঃখ শেষ করার আহ্বান জানিয়েছে। সে নিজের অপরাধ স্বীকার করেছে। সে উপলব্ধি করেছে—

"আমি একটা নিষ্ফল শুন্য।"

এই সময় সে নিজকর্মের জন্যে অনুতপ্ত। সে 'বিশ্ববিধাতার বিধি অন্তরে গ্রহণ' এই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা লাভ করেছে। এখানেই চরিত্রটি মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে। সবশেষে আলোচনার উপান্তে এসে বলা যায় যে 'আন্তিগোনে' নাটকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে চরিত্রটি সর্বদাই ক্রিয়াশীল সে এই ক্রেয়োন চরিত্র। সে অধর্মাচারী তকমা নিয়ে ব্যর্থ স্বামী এবং পিতার পরিচয় বহন করে বিধাতার শেষ দ্বন্দ্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে। আর এভাবেই সে হয়ে উঠেছে 'আন্তিগোনে' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র। এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

৬) আন্তিগোনে কোরাসের ভূমিকা

অ্যারিস্টোটল তার পোয়েটিকস গ্রন্থে গ্রিক নাট্যকলার আলোচনা সূত্রে প্রথম কোরাস প্রসঙ্গে তথ্য দিয়েছিলেন। কোরাসের ভূমিকা প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন

কোরাসকে একজন অভিনেতা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। কোরাস হবে সমগ্র নাটকের একটি উপাদান, নাটকের ক্রিয়াতে অংশগ্রহণ করবে ইউরিপিদিসের নাটকের মত নয়, সোফোক্লেসের নাটকের মত নয়।

গ্রিক উৎসবের দেবতা ডায়োনিসাস তার পূজার্চনার সময় নাচ গান আনন্দের যে উৎসব বা পরিবেশ তৈরি হত সেখানে যারা নাচ-গান করত তারাই কোরাস বলে পরিচিত। এই নৃত্য-গীত বাদক দলে নারী-পুরুষ উভয়ই থাকত। নাট্য ঘটনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, নাট্য চরিত্রের পরিণতি বিষয়ে মন্তব্য করা ও দর্শককে নাটক সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলা ছিল এদের কাজ।

গ্রিক প্রখ্যাত নাট্যকার সোফোক্লেস ৫৬ বছর বয়সে ৪৪০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বিশ্বভুবনজয়ী 'আন্তিগোনে' নাটক রচনা করেন। যেখানে উপস্থাপিত হয় রাজা ওইদিপৌসের কন্যা আন্তিগোনে ও তার প্রতিপক্ষ ক্রেয়োনের ট্র্যাজিক কাহিনী। ওইদিপৌসের দুই ছেলের মধ্যে ছোট ছেলে পলুনেইকেস বাইরের রাজাদের সাহায্যে এতইকেসের রাজ্য থিবেস আক্রমণ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি শোচনীয়ভাবে মৃত্যুবরণ করেন। নতুন রাজা ক্রেয়োন পলুনেইকেসের শেষ কৃত্য সম্পন্ন করতে দিতে চাইলেন না। কিন্তু আন্তিগোনে দৈব বিধান রক্ষা করার জন্য এবং ভ্রাতার প্রতি ভালোবাসায় সেই কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করে প্রাণদন্ডে দন্ডিত হলেন। ক্রেয়োনের পুত্র হাইমোনের গভীর আকর্ষণ ছিল আন্তিগোনের প্রতি। প্রণয়িনীর মুক্তি প্রার্থনা করেও তিনি ব্যর্থ হলেন। শেষে একজন, ভবিষ্যৎ ঘটনা তেইরেসিয়াস, ক্রেয়োনকে বারবার ভয় দেখালে তিনি আন্তিগোনেকে মুক্তি দেন। কিন্তু তখন আর তাকে রক্ষা করার সময় নেই। আন্তিগোনে মারা গেল, সেইসঙ্গে হাইমোনও। তারপর ক্রেয়নের স্ত্রী। বেঁচে রইলেন শুধু ক্রেয়োন। নাটকের এই মূল ঘটনার আবর্তে কোরাস বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। 'আন্তিগোনে' নাটকে কোরাসের বৃদ্ধদের দেখে আমাদের মনে হয় না তারা যেন এই সামাজিক অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের ভান্ডারের ধারক বরং তারা যেন আমাদের মতো দ্বিধাগ্রস্থ, আমাদেরই মত অনিশ্চিত, আমাদেরই মত ক্লান্তিপরায়ণ। এই বৃদ্ধরা সকলেই নিরীহ এবং শাসনযন্ত্রের অনুগত। এই অনুগত্যের মূল কারণ যে রাষ্ট্রের গুরুত্বের প্রতি বিশ্বাস তা নয় বরং কিছুটা ভয় এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বোধ। ফলে এই নাটকের অন্তর্গত ধর্মীয় বিশ্বাসের বৈপরিত্যের পাশাপাশি একটা রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে। স্বেচ্ছাচারী শক্তি, ব্যক্তির বিবেক, রাষ্ট্রের বিরোধ ও নাগরিকের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বৈপরীত্য।

(কোরাসের প্রবেশ সঙ্গীতের প্রথমেই ধ্বনিত হয়েছে নিরাপত্তাবোধ "কি অপূর্ব সূর্যোদয়।
জ্যোতির্ময় তোমাকে প্রণাম")

অর্থাৎ বিপদ কেটে যাওয়ার পরে এ যেন স্বস্তির বোধ। পূর্ব রাত্রের দুর্যোগের স্মৃতির পটভূমিকাতেই আজ ভোরের সূর্যদয়কে এত অপূর্ব, এত উজ্জ্বল মনে হয়েছে। কোরাসের বৃদ্ধরা যে-দিনকে অভ্যর্থনা করেছেন সে দিনটিকে তারা ভেবেছেন বিপর্যয় মুক্তির। তারা জেনেছেন যুদ্ধ শেষ, রাজা বিজয়ী, শত্রুরা পরাজিত। তাই তারা আহ্বান করেছেন দেবতা, দিওনুসুসকে, বিজয় সঙ্গীতে উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন।

আজকের বিচারে কোরাসের ভূমিকা অনেকক্ষেত্রেই..... হয়ে গেছে। শেক্সপীয়র এই কোরাসের অনুসরণ করেছিলেন কিন্তু তারা সেই অর্থে জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি মূলত তারা শেকসপীয়রীয় 'মাস' হিসেবে পরিচিত। তারা কেউ ফুল, ভাট কখনো নাগরিকবৃন্দ বা জনতা। 'ম্যাকবেথ' ইত্যাদি নাটকে আমরা এই 'মাস' জাতীয় চরিত্রের অবতারণা দেখি। রবীন্দ্রনাথ চরিত্র গুলিকে একটু অন্যভাবে কাজে লাগিয়ে কোরাসের গুরুত্বকে আকর্ষনীয় করে তুলেছেন। তার বাউল, ফকির, পাগল, দাদাঠাকুর, ঠাকুরদা ইত্যাদি কোরাস ক্যারেক্টার। 'বিসর্জন', 'মুক্তধারা', 'রথের রশি'র জনতা কোরাস জাতীয় চরিত্র। রবীন্দ্রপরবর্তী যুগেও এমনকি গণনাট্যেও এই চরিত্ররা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তাই কোরাস লিরিক নাটকের যুগ পার হয়ে আজকের এই জেট-নেট-সাইবার যুগেও অন্য নামে অন্য ভূমিকায় সক্রিয় রূপে দেখা যায়।

কোরাস চরিত্র মূলত দৈবপ্রেরিত তথা দেবতাদের শক্তিকে প্রতিপন্ন করে। দেবতারা স্বয়ং করেছেন এমনটি নয় বরং হতে পারে দেবতাদের শক্তিতে করা হয়েছে। এর ইঙ্গিত প্রহরীর কথাতেও ছিল—

"কোথাও কোনো চিহ্ন পাইনি
না কোদালের, না শাবলের,
কোন চাকার দাগ ছিল না
যে এই কাজটা করে গেছে
কোন চিহ্ন রেখে যায়নি"

যতক্ষণ না আন্তিগোনেকে প্রহরীরা ধরে আনলো ততক্ষণ পর্যন্ত এই দৈবী সংকেত নাটকের আবহাওয়ায় একটা থমথমে ভাব স্পর্শ করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু আইনভঙ্গকারীর পরিচয় উদঘাটিত হবার আগে কোরাসের দল একটি গান গেয়েছে যা মূলত মানুষের মহিমার। প্রতিমার পর প্রতিমা গেঁথেছেন বৃদ্ধরা উদাহরণের পর উদাহরণ দিয়েছেন কিভাবে মানুষ বস করেছে প্রকৃতিকে, জয় করেছে পশুপাখি, গড়েছে ভাষা-সমাজ-সভ্যতা। এক্ষেত্রে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণীয় তাদের কথায়, মানুষ কখনো চালিত হয় মহত্বের পথে কখনো বা অন্যায়ের পথে। শুভ-অশুভের বোধে কখনো কখনো ঘটে যায় তার চিন্তার বিপর্যয়। যে ন্যায়ের পথ শুভের পথভ্রষ্ট তাকে বৃদ্ধরা বলেছেন অধর্মচারী, মানুষের সৃষ্টির জগত থেকে বঞ্চিত।

কোরাসের মতে অধর্ম পথের যাত্রী, সেই যথার্থ নগরহীন নিরাশ্রয়। কিন্তু এই ন্যায়-অন্যায়, শুভ-অশুভ নির্ণয় হবে কিভাবে? একটি সনাতন ধর্মের নিরিখে তারা স্পষ্টভাবে সে কথা বলেননি। বৃদ্ধরা আন্তিগোনের বক্তব্যে

বিচলিত নয়। কিন্তু আন্তিগোনে নির্ভুল কিনা তাকে নিঃসন্দিগ্ধ মন, তাই তারা ক্রেয়োনকেই সমর্থন করেন। যদিও তারা সমস্ত ঘটনার মধ্যে একটা অস্বাভাবিকতার স্পর্শ দেখেন। আন্তিগোনেকে প্রহরী বেষ্টিত দেখে প্রথমে যে কথা তারা উচ্চারণ করেছেন তা হল

'একই দৈবী অঘটন (দাইমোনিয়োন)'

তারা আরও বলেছিলেন—

'হতভাগ্য পিতার হতভাগিনী কন্যা'।

কোরাস আন্তিগোনের আচরণে এমনই বিমূঢ় যে, এর কোন ব্যাখ্যা তারা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তাই একবার তাদের মনে হয়েছে এ যেন বংশানুক্রমিক অভিশাপ, মনে হয়েছে আন্তিগোনে উন্মাদ। শুভ-অশুভ বোধের বিপর্যয় ঘটে গেছে তার মনে। আন্তিগোনের মৃত্যু জনসাধারণের প্রস্তরাঘাতে হবে না, তার মৃত্যু হবে জীবন্ত সমাধিতে। তখন কোরাস অনুভব করেন। আর তাই প্রেমের দেবতার বন্দনাগান শুরু হয় অনিবার্যভাবে। তাই প্রেমের শক্তি—যা রক্তবন্ধনের সঙ্গে যুক্ত-তাই প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াই রাষ্ট্রশক্তির। তারপর দেখি কোরাস ধীরে ধীরে আন্তিগোনেকে, পুরুষানুক্রমিক আন্তিগোনেকে অভিশাপ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয় তার যথার্থ স্বরূপে 'রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তিনি স্বেচ্ছায় বিদ্রোহী'। বস্তুত কোরাস আন্তিগোনে নাটকে সততার পথকে অবলম্বন করে এগিয়ে চলেছে সামগ্রিক পটভূমি, কাহিনী। সব চরিত্রের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে কোরাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। এক পথে কোরাস উপলব্ধি করেছে দেবতাদের উদ্দেশ্য, ধর্মের নিয়ম। আরেক পথে উপলব্ধি এসেছে ক্রেয়োনের আঘাতে-আঘাতে, মৃত্যুতে-মৃত্যুতে। উপলব্ধি করেছে তার জীবনের নিষ্ফলতা। এই নিষ্ফলতার আর্তনাদে নাটকের সমাপ্তি।

একক-৬

তুলনামূলক নাটকের ট্র্যাজেডি

৭) আন্তিগোনে, হ্যামলেট, চাকভাঙা মধু নাটকের সময় ও পরিণিতি

প্রাচীন গ্রিসে এর বিকাশ ও সমৃদ্ধি। এই ট্রাজেডি রচয়িতাদের মধ্যে অন্যতম হলেন সফোক্লেস। তিনি প্রায় একশত নাটক রচনা করেন। এগুলির মধ্যে একটি অন্যতম জনপ্রিয় নাটক 'আন্তিগোনে'। মনুষ্যত্ব, বিশ্বছন্দের সঙ্গে তার সম্বন্ধে দুটি সর্বশক্তিমান মূল্যবোধের সংঘর্ষ, মাতৃভূমির প্রতি আকর্ষণ, নিসর্গশোভা, হৃদয় এবং যুক্তির মেঘ ও রৌদ্র, পাপ-পুণ্যের যুগ্মতোয়া নদী, দেহমনের মোহনা, বেঁচে থাকার জলতরঙ্গ এবং প্রেমের জন্য শহীদের মত মৃত্যুর সমুদ্রে আত্মসমর্পণ, সবমিলিয়ে নাটকটি মানব জীবনের চলচ্চিত্র। নাটকটি গ্রিক নাট্যকলার আদর্শে রূপায়িত হাওয়ায় ট্র্যাজেডি নাটকের সকল বৈশিষ্ট্যের সার্থক প্রকাশ ঘটেছে। এবার আমরা সে সম্পর্কে আলোচনা করব।

তবে এই আলোচনায় প্রবেশের আগে আমাদের ট্রাজেডি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা নেওয়া দরকার। গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টোটল তার পোয়েটিক্স গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ট্রাজেডির বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। অধ্যাপক শিশির কুমার দাশ অ্যারিস্টোটলের দেওয়া এই ট্র্যাজেডির অনুবাদ করেছেন এইভাবে

> "ট্র্যাজেডি হল একটি ক্রিয়ার অনুকরণ, ক্রিয়াটি গভীর, সম্পূর্ণ। তার একটি বিশেষ আয়তন আছে, তার প্রতিটি অঙ্গ ভাষার সৌন্দর্য মনোরম, ক্রিয়াটির প্রকাশরীতি বর্ণনাত্মক নয়, নাটকীয় আর এই ক্রিয়া ভিতি ও করুণার উদ্রেকের মধ্যে দিয়ে অনুরূপ অনুভূতি গুলির পরিশুদ্ধি ঘটায়।"

উপরিউক্ত সংজ্ঞায় উল্লিখিত ট্র্যাজেডির স্বরূপ বা বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্যে আমরা এবার আন্তিগোনে নাটকটি বিচার করব।

প্রথমেই আমরা যদি আন্তিগোনে নাটকের কাহিনীটি পর্যালোচনা করি তাহলে দেখব এ নাটকের কাহিনীটি একটি গভীর সম্পূর্ণ, বিশেষ আয়তন বিশিষ্ট ক্রিয়ার অনুকরণ। এ নাটকে দুটি সর্বশক্তিমান মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব প্রকাশিত। এ দ্বন্দ্বের একদিকে রাজা ওইদিপোউসের কন্যা আন্তিগোনে অন্যদিকে রাজা ক্রেয়ন। আন্তিগোনের নামে এ নাটকের নামকরণ হলেও এ নাটকে ক্রেয়নই নায়ক তথা কেন্দ্রীয় চরিত্র। নাটকটি শেষ হয়েছে আন্তিগোনের মৃত্যুতে নয়, ক্রেয়নের বিপর্যয়। এই ক্রেয়োন চরিত্রে অ্যারিস্টোটল নির্দেশিত নায়ক চরিত্রের সকল বৈশিষ্ট্যই পরিলক্ষিত। অ্যারিস্টোটলের মতে ট্রাজেডির নায়ক হবে খ্যাতিমান, উচ্চবংশজাত গর্বিত (highly renounced and prosperous) এবং সাধারন স্তর হতে উচ্চে অসাধারণ বুদ্ধিমান (above the common level)। এই নাটকে ক্রেয়ন চরিত্রে এই বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়। সে যে বুদ্ধিমান, কূটকৌশলী তার পরিচয় নাটকের পূর্বকথা অংশে বিবৃত। সে সর্বশক্তিমান সম্রাট, রাষ্ট্রই তার কাছে সব। সে যেমন পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সচেতন তেমনি

নারীদের কর্মক্ষেত্রের সংকীর্ণতা সম্বন্ধেও সেই পরিমান কৃতনিশ্চয়। তার কাছে বড় রাষ্ট্রের নিয়ম, প্রধান অস্ত্র রাষ্ট্রশক্তি। তা তার কথাতেই পরিস্কার—

"আমি যদি দেখি প্রজাদের সামনে বিপদ

আমি চুপ করে থাকব না

দেশের শত্রুকে আমি কোনদিন

বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে পারবো না।

আমি মনে করি রাষ্ট্র আমাদের যথার্থ আশ্রয়

রাষ্ট্র আমাদের নিরাপত্তা

রাষ্ট্রের কল্যাণ আমাদের কল্যাণ

রাষ্ট্র আমাদের বন্ধু।"

সে এই রাষ্ট্রকে হাতিয়ার করে সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে চেয়েছে। তাই আমরা দেখি ওইদিপৌসের পুত্র পলুনেইকেসের কাজকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা মনে করে তার মৃতদেহ সমাধিস্ত না করার নির্দেশ দিয়েছে। আন্তিগোনে মৃতদেহ সমাধিস্ত করলে তার কপালেও জুটেছে মৃত্যুদণ্ডের পরোয়ানা। ক্রেয়ন কারো কথাই শোনেনি। তার কথায়—

"যদি কেউ এমন ভাবে রাষ্ট্রের আদেশ

অমান্য করেও দণ্ডিত না হয়

তাহলে বলতে হবে এই মেয়েটিই পুরুষ

আর আমি একটা স্ত্রীলোক

আমার বোনের মেয়ে হোক

বা আমার কোনো নিকটাত্মীয় হোক

দন্ড তাকে পেতে হবে"

এমনকি সে থিবেসের অন্ধ ভবিষ্যৎ বক্তা তেইরেসিয়াসের উপদেশও শোনেনি। বরং তাঁর কথায় ক্রুদ্ধ হয়েছে, তাকে সুচতুর অর্থলোভী বলতেও দ্বিধা করেননি। কিন্তু তেইরেসিয়াস যখন ক্রুদ্ধ হয়ে ভবিষ্যতের কথা বলেছে তখন ক্রেয়ন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। সে কোরাস দলের কাছে পরামর্শ চেয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের কথামতো নিজের উপদেশ পরিবর্তন করেছে। তার কথায়

"আমার আদেশ ছিল মৃত্যুর

আমি দিচ্ছি মুক্তির আদেশ"

কিন্তু তার এই সত্য বুঝতে অনেক দেরি হয়ে গেছে। এরই মধ্যে সে দেখেছে পুত্র হাইমোনের মৃতদেহ। তখন কোরাস দলকে বলেছে

"দ্যাখো দ্যাখো ভয়ঙ্কর হঠকারিতা

হত আর হত্যাকারী, পুত্র আর পিতা।

মৃত, মৃত আমার সন্তান

এখনো শরীরে তার যৌবন অম্লান

না, না কোন দোষ নেই তার

সমস্ত আমার দোষ, এ পাপ আমার।"

এরপরেও সে শুনেছে রানী ইউরুদিকের মৃত্যু। তার এই অবস্থা আমাদের 'pity and fear' এর উদ্রেগ করে। এই নাটকে পবিত্র কাজের জন্য আন্তিগোনে প্রাণদান করে সকলের সহানুভূতির পাত্রী হয়ে উঠলেও ক্রেয়নই এ নাটকে 'doing and suffering' এর ভোক্তা। তার করুণ ট্র্যাজিক পরিণতিতে আমরা ভীত হয়ে পড়ি।

এরপর দেখি ক্রেয়ন স্বীকার করেছে তার পাপ। তার উপলব্ধি—

"আমি একটা নিষ্ফল শুন্য।"

তার আর কিছুই চাওয়ার নেই, পাওয়ার নেই। তাই আমরা দেখি সে বলেছে—

"বিধাতার দন্ডভারে

নুয়ে আসছে

মাথা"

সে নিজের কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত। 'বিশ্ববিধাতার বিধি অন্তরে গ্রহণ' এই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা লাভ করেছে। এই ঘটনা আমাদের ক্যাথারসিস বা ভাববিমোচন ঘটায়।

এছাড়াও ট্রাজেডির অন্যান্য সকল বৈশিষ্ট্য এখানে রয়েছে। যেমন ঘটনাটির প্রকাশরীতি বর্ণনামূলক নয়, নাটকীয় উক্তি-প্রত্যুক্তিতে ভরা সংক্ষিপ্ত, প্রাণময়, গতিশীল সংলাপ দ্বারা নাটক গঠিত। অর্থাৎ ভাষা ছন্দোবদ্ধ।

তাই সবশেষে আলোচনার উপান্তে এসে আমরা বলতে পারি যে এ নাটক একটি সার্থক ট্র্যাজেডি নাটক। এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

৮) নারীর প্রতি অত্যাচারী শাসক ক্রেয়নের দৃষ্টিভঙ্গী

সুদূর অতীতে গ্রিসে ট্র্যাজেডির উদ্ভব এবং সেখানেই এর গৌরবময় সমৃদ্ধি। মূলত তিনজন— এস্কাইলাস, সফোক্লিস, ইউরিপিদিসের হাতে ট্র্যাজেডি নাটকের বীজবপন ও অসামান্য পরিণতি। বলাবাহুল্য এরা তিনজনেই হলেন বিশ্বট্র্যাজেডির জনক। সফোক্লিস প্রায় একশত নাটক রচনা করেছিলেন। এরমধ্যে তার 'আন্তিগোনে' নাটকটি ভুবনজয়ী। রাজা ওইদিপৌসের কন্যা ও তার প্রতিপক্ষ ক্রেয়নের ট্রাজিক কাহিনী উপস্থাপিত হয়েছে 'আন্তিগোনে' নাটকে। প্রসঙ্গত ক্রেয়ন চরিত্রের সবিশেষ আলোচনা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

ন্যায়-অন্যায়ের দ্বন্দ্ব, রাষ্ট্রক্ষমতার ন্যায়বোধের সঙ্গে অন্যায়ের দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে আলোচ্য নাটকে। নাটকের মূল দ্বন্দ্ব বা সংঘাতের ফলে যে মৃত্যু তার পিছনে রয়েছে রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারীরা ও তাদের কপটনীতি। নাটকে কে ঠিক আর কে ভুল তা বলা মুশকিল। ক্রেয়নের মতে রাষ্ট্রদ্রোহীতার ফলে ও আদর্শের জন্য তিনি আন্তিগোনে কে শাস্তি দিয়েছে। তার কাছে এই শাস্তি রাষ্ট্রপক্ষের সত্য, মঙ্গল ও ন্যায়। ক্রেয়ন রাষ্ট্রের পক্ষে, নিয়মের পক্ষে, আইন ও শৃঙ্খলার পক্ষে আর আন্তিগোনে মানবসমাজের অলিখিত নিয়ম ও মানবসত্তার পক্ষে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করেছে রাষ্ট্রের প্রতিনিধি ক্রেয়ন তাকে দণ্ড দিয়েছেন। রাষ্ট্রের নির্দেশ অমান্য করেছে আন্তিগোনে তাই তাঁর মৃত্যু। আবার ক্রেয়ন লঙ্ঘন করেছেন চিরন্তন বিধি তাই সেটাই তাঁর মৃত্যু। দুটি চরিত্র দুটি ভিন্ন মুখ থেকে নীতির সমর্থন খুঁজেছে। দু'জনেই আংশিক ঠিক। দু'জনেই আংশিক ভুল। নীতিকে তারা দেখেছে খন্ডিত দৃষ্টিতে।

নাট্যকার সচেতনভাবে ক্রেয়ন আর আন্তিগোনেকে গড়েছেন পরস্পর বিরোধী ভূমিকায়। ক্রেয়ন শব্দের অর্থ শাসক। আন্তিগোনের অর্থ বিদ্রোহিনী। ক্রেয়ন বার বার বলেছে সে নারীর কাছে নতি স্বীকার করতে চান না। মেয়েদের স্থান অন্তঃপুরে, রাষ্ট্রকক্ষে নয়। সে পুরুষের ক্ষমতা সম্বন্ধে যে পরিমাণ সচেতন নারীর কর্মক্ষেত্রের সংকীর্ণতা সম্বন্ধেও সেই পরিমাণে কৃতনিশ্চয়। ক্রেয়নের আনুগত্য রাষ্ট্র, আন্তিগোনের পরিবার। একজনের ভূমিকা শাসকের, পিতার; আরেকজনের ভূমিকা শোষিতের, কন্যার এবং ভগ্নির। ওইদিপৌসের ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতার সঙ্গে ক্রেয়নের যোগ লক্ষ্য করা যায়। সে কখনোই নির্দেশিত ও যুক্তিলঙ্ঘিত নয়। হাইমোনের সঙ্গে বিতর্কের সময় সে সদম্ভে ঘোষণা করেছিল যে রাজা অন্যের ইচ্ছায় কখনোই পরিচালিত হবে না। তাই হাইমোন ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিল

"সেক্ষেত্রে নির্জন দ্বীপে রাজা হলে ভালো করতেন"

ক্রেয়ন চরিত্র একদিকে যেমন গণতন্ত্র বিরোধী অন্যদিকে প্রবল অহমিকা পরায়ণ। এই অহমিকা থেকে জন্ম নিয়েছে তার সবচেয়ে বড় ত্রুট, 'হুব্রিস'। গ্রিকরা যাকে মনে করতেন মানুষের সবচেয়ে বড় অপরাধ। ক্রেয়ন শুধু অগণতান্ত্রিক নয়, সে কোন রকম স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নয়। এথেনীয় গণতন্ত্রের একটা বড় অধিকার ছিল বাক্যের স্বাধীনতা— 'পাররেসিয়া'। স্বৈরাচারী ক্রেয়নও বাক্যের স্বাধীনতা বিরোধী। বিতর্কে তাই তিনি এত অসহিষ্ণু।

ক্রেয়ন বৃদ্ধদের সাবধান করেছে যেন তারা কোনোভাবেই আইন ভঙ্গের প্রশ্রয় না দেয়। যখন প্রহরীর মুখে সে আইন ভঙ্গের কথা শুনেছে তখন অবিলম্বে ধরে নিয়েছে যে এর পিছনে কোনো ষড়যন্ত্র আছে। প্রহরীকে সে মৃত্যুদণ্ডের ভয় দেখিয়েছে। বৃদ্ধেরা যখন বলেন এ কোন মানুষের কাজ নয়, দেবতার কাজ সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। যেন তার ব্যাখ্যাই একমাত্র ব্যাখ্যা, যেন সে অভ্রান্ত। বস্তুত নাটকের গোড়া থেকেই পাঠক তথা দর্শকের সঙ্গে ক্রেয়নের দূরত্ব রচিত হয়েছে। তারপর ক্রমশই বাড়তে থাকে সেই দূরত্ব। আমরা লক্ষ্য করি তার দর্প, অহংকার ও তার হৃদয়হীনতা।

আন্তিগোনের রক্তবন্ধনের প্রতি আকর্ষণ, মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা বা দেবতাদের অলিখিত শাশ্বত নিয়মের প্রতি নিষ্ঠা তার চরিত্রের কেন্দ্রীয় শক্তি। তবু সফোক্লিসের নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র শুধু আন্তিগোনে নয়। নাটকের শেষ হয়েছে আন্তিগোনের মৃত্যুতে নয়, ক্রেয়নের বিপর্যয়ে। ক্রেয়নকে সফোক্লেস রেখেছেন নাটকের কেন্দ্রে, আন্তিগোনেকে সৃষ্টি করেছেন ক্রেয়নের পতনকে গভীর এবং সর্বগ্রাসী করে তোলার জন্য। বৃদ্ধেরা যদিও কখনোই সরাসরি ক্রেয়নের বিপক্ষে নন। তবু তারা একবার সাহস করে ক্রেয়নকে সত্যমর্ম দিয়েছেন, তিনি যেন মৃতদেহ অসম্মানিত না করেন। আন্তিগোনের কাজের প্রথম সমর্থন এসেছে প্রহরীর কাছ থেকে। তারপর হাইমোন ও অবশেষে তেইরেসিয়াসের কাছ থেকে এবং তারা প্রত্যেকে প্রবল বিরোধিতা পেয়েছে ক্রেয়নের কাছ থেকে।

ক্রেয়ন আন্তিগোনেকে দেখেছে তার ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে, তার সিদ্ধান্তের বিরোধি রূপে। সে একাধিকবার বলেছে নারীর কাছে পরাজয় স্বীকার করবে না। অথচ তার দর্পের অবক্ষয় হয়েছে এক নারীর কাছেই, যে নারী শাশ্বত নিয়মের পক্ষে, তার পতন এসেছে এক যুবকের কাছ থেকে, যে যুবককে ক্রেয়ন অবজ্ঞা করেছিল অপরিণত বলে, নারীর আঁচলে বাঁধা কাপুরুষ বলে, পতন এসেছে এক অন্ধ বৃদ্ধের কাছ থেকে, যাকে তিনি অর্থগৃধ্নু বলে ভর্ৎসনা করেছিল। নাটকের এই তিনটি স্তরেই আমরা দেখেছি তাকে এক উদ্ধত ও গর্বিত রাজার রূপে। তারপরে তার অবসানের কাহিনী। নাটকটিকে অধিকার করে রেখেছে তার গর্ভচূর্ণ রূপ ও মর্মন্তুদ পরিণতি। যে ক্রেয়ন হাইমোনকে বলেছিল—

"আমাকে এখন জ্ঞান নিতে হবে
দাড়ি গোঁফ না ওঠা একটা ছোকরার কাছে?"

কিংবা—

"লোকে যেন একথা না বলে
একটা মেয়ের কাছে হেরে গেছি"

সেই ক্রেয়নই জ্ঞান নিয়েছে আন্তিগোনে ও হাইমোনের মৃত্যু থেকে, হেরে গেছে একটা মেয়ের কাছে, স্বীকার করেছে—

"জেনেছি দুঃখের মূল্য, পেয়েছি কঠিন

ঈশ্বরের দণ্ড আজ রুঢ় রুক্ষ পথে

টেনে নিয়ে কষাঘাতে করেছেন নত"

সামগ্রিক আলোচনা শেষে তাই বলা যায় ক্রেয়ন অগণতান্ত্রিক, স্বৈরাচারী, হটকারী, নিষ্ঠুর ও অবিবেকী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার চরিত্রটির রূপান্তর ঘটেছে। আন্তিগোনের বিদ্রোহ ক্রেয়নকে শিক্ষিত করেছে। তাই শেষপর্যন্ত ক্রেয়ন ক্ষমাভিক্ষার চরিত্র হয়ে উঠেছে। সর্বোপরি হেগেল কথিত দ্বন্দ্ব সৃষ্টিতে অপরিসীম মহিমান্বিত।

৯) 'আন্তিগোনে', 'চাকভাঙা মধু', 'কন্যাদান' নাটকের নারীবাদ সম্বন্ধে আলোচনা

সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে নাটক অন্যতম। নাটক হল আধুনিক ও গতিশীল শিল্প প্রকরণ। আমাদের আলোচ্য বিষয় হল এই নাটকে নারীদের প্রাধান্য, কীভাবে তারা প্রতিবাদ করেছে। আলোচ্য নাটকে নারীর প্রতিবাদ দু-রকম ভাবে উঠে এসেছে। একদিকে গোটা সমাজ যেখানে সমাজের মানুষের অপমান নারীর অপমান হয়ে উঠেছে, সেখানে নারীর মানবিক চেতনা জাগ্রত হয়ে উঠেছে। আর একদিকে নারী একাকিনী, যেখানে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী অপমানিত শুধু নারী বল, সেখানে জেগে উঠেছে নারীবাদী চেতনা।

এবার আলোচ্য নাটকগুলি আলোচনা করে দেখা যাক কীভাবে নাটকগুলিতে নারীর চেতনা জাগ্রত হয়েছে, তারা প্রতিবাদে মুখর হয়েছে। প্রথমে আন্তিগোনের কথায় আসা যাক। আন্তিগোনে রাজা ওইদিপৌসের এক রাণী ইয়োকাস্তার কন্যা। এতইক্লেস ও পলুনেইকেস তার দুই ভাই। এটি গ্রিক ট্রাজেডি, নারীসত্তাকে কলুষিত করে জন্ম দিয়েছিল ওইদিপৌস তার চার সন্তানকে। নিয়তি তাদের নির্মম পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। ক্রেয়নের ষড়যন্ত্রের শিকার দুই ভাই, আন্তিগোনের মামা ক্রেয়ন, দুই ভাই সিংহাসন দখলের লড়াইয়ে একে অন্যের হাতে প্রাণ দেয়। ক্রেয়ন সিংহাসনে বসেন। এতইক্লেস, পলুনেইকেসকে অন্যায় ভাবে সিংহাসনের দখল দেয় না, ক্রেয়ন বড় ভাইকে দিয়েছে সমাধির সম্মান কিন্তু ছোট ভাই পলুনেইকেসকে তা দেননি। বলেছেন তার দেহ হবে শকুন কুকুরের খাদ্য। আন্তিগোনে এরকম অবস্থায় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। এই যে তার প্রতিবাদ, নারী হিসেবে তার স্বকীয়তা, অধিকার থেকেও মৌলিক ন্যায়-নীতি, মানবিক চেতনার কথা আছে।

'কন্যাদান' নাটকের বাবা চরিত্র যিনি, নাথ দেওলাল কর, রাজনীতির সঙ্গে জড়িত, বিধানসভার সদস্য। সব সময় তিনি তার কন্যা জ্যোতিকে নৈতিক শিক্ষা দিয়েছেন। দলিতদের সঙ্গে কখনো নীচু আচরণ করা উচিত নয়এটাই তিনি বারবার বলে এসেছেন। জ্যোতি দলিত সমাজের অরুণ আঠালকে ভালোবাসে, সে একজন মেথর। তাদের বিয়ে হয়। বিয়ের পর অরুণ জ্যোতিকে নানা রকম অত্যাচার করে, শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার। এটাই তার প্রবৃত্তি। যেটা জ্যোতির পরিবারের লোকজন জ্যোতির ওপর হওয়া এই অত্যাচার মেনে নিতে পারেনি। তাই নাথ দেওলাল কর অরুণ আঠালের জীবনীর ওপর খারাপ বক্তৃতা দেয়। জ্যোতি কিন্তু তার স্বামীকে অস্বীকার করেন। সে তার স্বামীর প্রবৃত্তিকে মেনে নিয়েছে প্রবৃত্তিকে বাদ দেওয়া যাবে না, এটা সে ভালোভাবেই জানে। যে দলিত

সমাজের গর্ব করে নাথ রাজনীতিতে, বাস্তবতার সাথে তার কোন মিল নেই। স্বামীর এই অপমান সহ্য করতে না পেরে কন্যা জ্যোতি বাড়ি বয়ে এসে তাকে কথা শুনিয়ে যায়। বলে যে, মহারাণী যেমন হয় তেমনি সে মেথরাণী। স্বামীর সঙ্গে স্বামীর পরিচয়ে থাকবে সে, লড়াইটা তার স্বামীর সাথে নয়, সমাজের সাথে। যারা মুখোশ পরে ভালো সাজার অভিনয় করে তাদের জ্যোতি ধিক্কার দিয়েছেন। নারীর অসম্মান এখানে মানবিক চেতনায় পরিপূর্ণ। নারী বলে প্রতিবাদ নয়, প্রতিবাদ মানবিক চেতনার।

'চাকভাঙা মধু' নাটকের অন্যতম সুদখোর চরিত্র অঘোর ঘোষ। সে গ্রামের কোন মানুষকে শান্তিপূর্ণভাবে বাঁচতে দেয় না। সুদের জালে সবাইকে জড়িয়ে ফেলেছে। যেই মুহূর্তে তাকে সাপে কামড়ায়। কেউ তাকে বাঁচাতে চায় না, সে মরলেই তাদের ভালো, এমনকি মাতলাও না, সে বড় ওঝা সেও না। তার মেয়ে বাদামী সে গর্ভবতী। স্বামী তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এই বাদামী তার মানবিক চেতনার নিরিখে অঘোর ঘোষকে বাঁচাতে চায়। অঘোর ঘোষ মাতলার ঝাড়ফুঁকে বেচে ওঠে। কিন্তু বেঁচে ওঠেই সে বাদামীর দিকে হাত বাড়ায়, অশ্লীল ইঙ্গিত করে, এই অপমানটা বাদামী একার। সে প্রতিশোধ নিতে চায়, এটা তার নারীসত্তার প্রতিশোধ। যে বাদামি মানবিকতার খাতিরে অঘোর ঘোষকে বাঁচিয়েছিল সেই বাদামীই তার নারীসত্তার অপমানের প্রতিবাদে গর্জে উঠলো। শেষ পর্যন্ত সে অপমানের প্রতিবাদে অঘোর ঘোষকে মেরে ফেলল। এই প্রতিবাদ তার সত্তার মধ্যে থেকে উঠে এসেছে। এই প্রতিবাদ তার নারীবাদী চেতনার প্রতিবাদ।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর কোন অস্তিত্ব নেইএটা বেশিদিন চলতে পারে না, তাই নারীসত্তার জাগরণ ঘটেছে। নারীর চেতনা জেগে উঠেছে। নারীদের অসম্মান করা উচিত নয়। যারা অসম্মান করে তাদের শাস্তি পাওয়া উচিত। অতএব আমাদের আলোচ্য নাটকে আমরা দু'ধরনের নারী চরিত্র পেয়েছি, এক মানবিক চেতনা সম্পন্ন নারী দুই নারীসত্তা জেগে উঠেছে যে নারীর মধ্যে। আমরা আশা রাখবো এমন কোন এক নতুন সমাজের জন্ম হবে যেখানে নারীরা পূর্ণ হয়ে উঠবে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

১। দিলীপকুমার চক্রবর্তী, তুলনামূলক সাহিত্য একটি তির্যক প্ররোচণা, সম্পাদনা সুমন গুণ, ২০১১, একুশ শতক, কলকাতা।

২। ড. জয়ন্ত গোস্বামী, তুলনামূলক সাহিত্য গবেষণা পদ্ধতি ও প্রয়োগ, ১৭ মার্চ ১৯৯৫, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

৩। 'তুলনামূলক সাহিত্য, মৃত্যুর মিথ বনাম বাস্তবতা', সুমন সাজ্জাদ, মাওলা ব্রাদার্স প্রকাশনী।

৪। তুলনামূলক সাহিত্যের কথা, দেবজিৎ পাল।

৫। 'তুলনামূলক ভারতীয় সাহিত্য সমালোচনা, তত্ত্ব, নির্মাণ ও সৃষ্টি', দিয়া পাবলিকেশন।

৬। Gayatri Chakravorty Spivak, Nationalism and the Imagination, 2010, Seagull Books, Calcutta।

৭। Gayatri Chakravorty Spivak, Death of a Discipline, 2004, Seagull Books, Calcutta।

৮। Swapan Majumdar, 'Comparative Literature Indian Dimensions', Comparative Literature Indian Dimensions, 1987, Papyrus, Calcutta।

৯। Douwe W Fokkema, 'Cultural Relativism Reconsidered Comparative Literature and Intercultural Relations', Issues in General & Comparative Literature, Papyrus, Calcutta, August 1987.

১০। K. Ayyappa Paniker, Spotlight On Comparative Indian Literature, 1992, Calcutta.

সম্ভাব্য প্রশ্ন :

১। বাংলা সাহিত্যে তুলনামূলক সাহিত্য আলোচনা কোন রচনার মাধ্যমে সূচিত হয়? তুলনামূলক সাহিত্য সমালোচনার স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো। উনিশ শতকে এই ধরনের সমালোচনার প্রয়োজন নির্দেশ করো।

২। তুলনামূলক সাহিত্য কাকে বলে? তুলনামূলক সাহিত্য সমালোচনার প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করো।

৩। তুলনামূলক সাহিত্যের সংজ্ঞা এবং স্বরূপ বিশ্লেষণ করো।

৪। তোমাদের পঠিত নাটকগুলিতে প্রতিবাদী নারী চরিত্রের প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করো।

৫। পাঠ্য তালিকাভুক্ত নাটকগুলিতে নাট্যকারেরা যে ট্রাজেডি তুলে ধরেছেন, তা নিজের ভাষায় যুক্তিসহ উল্লেখ করো।

৬। যেকোনো শাসকের চরিত্রই স্থান-কাল নির্বিশেষে নারীদের প্রতি এক রকমই থাকে — তোমাদের পঠিত নাটক অবলম্বনে তা আলোচনা করো।

৭। পঠিত নাটকগুলির মধ্যে প্রেমিক ভাবনা এবং মানবিকতার যে পরিচয় ফুটে উঠেছে তা পর্যালোচনা করো।

৮। পিতা-পুত্র ও পিতা-কন্যার দ্বন্দ্ব পঠিত নাটকগুলিতে কিভাবে উল্লিখিত হয়েছে তা নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করো।

৯। "জেনেছি দুঃখের মূল্য, পেয়েছি কঠিন

ঈশ্বরের দ্বন্দ্ব আজ রুঢ় রুক্ষ পথে

টেনে নিয়ে কশাঘাতে করেছেন নত" — পঠিত নাটকগুলির মধ্যে প্রতিবাদের ভিন্নতা উঠে এসেছে, তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করো।

১০। পাঠ্য তালিকাভুক্ত নাটকগুলির মধ্যে শাসকের শোষণ পদ্ধতির ভিন্নতা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নাটকে উঠে এসেছে, তা নিজের ভাষায় বিশ্লেষণ সহ আলোকপাত করো।

১১। পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত নাটকগুলির মধ্যে নর-নারীর প্রেম ভালবাসার স্থান, কাল, সময় বিশেষ ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে, তা নিজের ভাষায় আলোচনা করো।